দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব

শামসুন্নাহার নিজামী

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব

শামসুন্নাহার নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৪৩

১১তম প্রকাশ (আধু ঃ ৮ম প্রকাশ)

জমাদিউল আউয়াল	১৪৩৩
চৈত্র	১৪১৮
এপ্রিল	২০১২

বিনিময় ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

DIN PROTISHTHAY MOHILADER DAYITTA. by Samsunnahar Nizami. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 25.00 Only.

www.bjilibrary.com

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা কায়েমের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির সত্যিকার কল্যাণ। এ বিধান কায়েমের দায়িত্ব প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর। এ দেশে পুরুষদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজ অনেকটা অগ্রসর হলেও নারী মহলে এখনো তেমন দানা বেঁধে উঠেনি। ইসলাম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং শিক্ষা নেই বলেই আমাদের মুসলিম বোনেরা এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহতারামা সামসুন্নাহার নিজামী মুসলিম নারীদেরকে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মানসে এ পুস্তকটি লিখেছেন। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক পাঠিকা এ পুস্তক থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালাভে সমর্থ হবেন।

—প্রকাশক

www.bjilibrary.com

সূচী পত্র

ভূমিকা	৫
নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য	৯
এ কাজ কি ফরয ?	১৪
এ দায়িত্ব কি শুধু পুরুষের ?	২৪
অতীত যুগের মহিলাদের ভূমিকা	৩৩
বর্তমান সমাজে মহিলাদের ভূমিকা	৫০

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

শতকরা ৮৭জন মুসলমানের আবাস ভূমি এ বাংলাদেশ। হযরত শাহ জালাল র., হযরত শাহ্ মাখদুমের স্মৃতি বিজড়িত এ বাংলাদেশ। কিন্তু এ ভূখণ্ডটুকুকে কোনক্রমেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা চলে না। বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, এটা এমন একটি ভূখণ্ড যেখানে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করে যাদের জীবন দর্শন বিভিন্ন। কেউ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কেউবা বিশ্বাস করে অন্য কোন মতবাদ বা মতাদর্শে। অথচ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এরা মুসলমান। বিয়ে-শাদী, দাফন-কাফন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোল্লা-মৌলভী ছাড়া চলে না। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে হলেও ইসলামকে অস্বীকার করার কোন পথ বা উপায় তাদের নেই। তাই তো আমরা দেখতে পাই, যে লোকটি সারা জীবনে আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ মানলো না তার মৃত্যুর পরেও কুরআনখানির ধুম পড়ে যায়। আবার ব্যক্তিগত জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারীকেও অনেক সময় দেখা যায় জীবন দর্শন হিসেবে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দানে তৎপর। অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামকেও জীবনের ব্যক্তিগত গণ্ডির মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি তার নেই। অথচ ইসলাম বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠাযোগ্য একটি প্রগতিশীল পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কুরআন মজীদে ইসলামকে কোথাও ধর্ম বলা হয়নি। বলা হয়েছে دين। আবার শুধু দ্বীন নয় বরং الدين। বলা হয়েছে। যার অর্থ This is the only way of life বা একমাত্র জীবন বিধান। A way এবং The way-র পার্থক্য যতোখানি دين এবং الدين। -এর পার্থক্য ততোখানি। সুতরাং মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম এসেছে যার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং নবী এবং রাসূলগণ।

আদম আ. থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত নবুওয়াতের এক দীর্ঘ ধারা এসেছে দুনিয়ার মানুষকে পথ দেখানোর জন্যে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর আগমনের সাথে সাথে বন্ধ হয়েছে নবুওয়াতের সেই ধারা। এরপর আর কোন নবী আসবেন না। অথচ ইসলাম তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য সহ প্রতিষ্ঠিত থাকবে এ দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত। কে বা কারা করবে এ দায়িত্ব পালন ? যদি কেউ না করে তবে কিভাবে এ দুনিয়াতে সে আদর্শ সঠিকরূপে টিকে থাকবে ? তাই এ দায়িত্ব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে না দিয়ে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীকেই দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের নির্দেশ ঃ

www.bjilibrary.com

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে করে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

এই সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব আজ আমাদেরই যারা মুসলমান নামে পরিচিত এবং এ দায়িত্ব শুধু পুরুষেরই নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আল্লাহর সব বান্দাহই এর আওতাভুক্ত।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক পরস্পর বন্ধু ও সাথী। তারা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ; সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। এ মু'মিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এ চির সবুজ-শ্যামল বাগিচায় তাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বসবাসের জায়গা থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১-৭২

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূ'তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের এ দুনিয়ার দায়িত্ব সার্বিকভাবে পালনকারীদের সফলতা এবং অমান্যকারীদের

www.bjilibrary.com

ব্যর্থতার বর্ণনা দিয়েছেন এবং দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমভাবে দায়িত্বশীল বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لاَاُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ٥

"উত্তরে আল্লাহ বললেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে কারও কাজকে বিনষ্ট করে দেব না, পুরুষ হোক কি স্ত্রী—তোমরা সবাই সমজাতের লোক। কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই জন্য লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সব অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। আল্লাহর নিকট এটাই তাদের প্রতিফল। আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র আল্লাহর কাছেই পাওয়া যেতে পারে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫

এমনিভাবে কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও ইকামতে দ্বীনের কাজের জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। ইকামতে দ্বীনের এই দায়িত্ব কি, কেমনভাবেই বা নারীরা এ দায়িত্ব পালন করবে—এ বইয়ে আমরা এ বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব।

ইকামতে দ্বীনের অর্থ ও সংজ্ঞা

اِقَامَةٌ শব্দটির আরবীতে অনেক প্রতিশব্দ আছে। এর সহজ অর্থ হলো কায়েম করা, চালু করা, খাড়া করা, অস্তিত্বে আনা ইত্যাদি।

কুরআন মজিদে اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ কথাটি অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো নামায কায়েম করা। নামাযের মাসলা-মাসায়েল শেখা, নামাযের ওয়াজ করাকে নামায কায়েম করা বলে না। বাস্তবে নামায চালু হওয়াকে ইকামতে সালাত বলে। কোন ব্যক্তির জীবনে নামায প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হলো সে নিয়মিত সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নামায আদায় করে।

www.bjilibrary.com

دِيـنٌ শব্দটি কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা। বিভিন্ন অর্থে কুরআন মজীদে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বীন-শব্দটি আল কুরআনে, হাদীসে এবং আরবী সাহিত্যে চারটি অর্থ বহন করে ঃ

১. প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি

২. আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা

৩. আইন-কানুন ও বিধি-বিধান

৪. পরিণতি, পরিণাম, প্রতিফল ও প্রতিদান।

আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি এ চার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এক অর্থে আবার কোথাও একাধিক অর্থে এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। কখন কোথায় এর কি অর্থ হবে তা বাক্যের আগে ও পরের যোগসূত্র থেকে পরিষ্কার বুঝে নেয়া যায়। সাধারণভাবে দ্বীন বলতে "দ্বীন ইসলামকেই" বুঝানো হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ্ পাক দ্বীন ইসলামকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"আল্লাহর কাছে স্বীকৃত ও মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।" এখানে বিধি-বিধান বা জীবন ব্যবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, দ্বীন ইসলাম শব্দের মধ্যে দ্বীন শব্দটির চারটি অর্থই নিহিত রয়েছে। এর সারকথা হলো ঃ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর মানতে হবে, আর কারো মানা যাবে না। মানুষ নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, মানুষের কল্যাণকর স্বাভাবিক বাস্তব পথ হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত পথ। মানুষের এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এ জীবনের পর আর এক জীবন আসবে। সেখানে তার যাবতীয় কাজের হিসেব দিতে হবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল বা পরিণতি ভোগ করতে হবে—যার নাম আখেরাত। সুতরাং ইকামতে দ্বীনের সার্বিক অর্থ হলো আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা।

❐

www.bjilibrary.com

নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

মানুষকে সৃষ্টি করে এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তাকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন যুগে যুগে নবী-রাসূল যারা মানুষকে দেখিয়েছেন শাশ্বত সুন্দর কল্যাণকর পথ, যে পথ দেখানোর ওয়াদা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানো মুহূর্তে করেছিলেন ঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"অতপর আমার কাছ থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছবে যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্যে কোন ভয় বা চিন্তার কারণ থাকবে না। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮-৩৯

উপরোক্ত আয়াতে আমরা দেখতে পাই মানব জাতির জন্যে রয়েছে দু' ধরনের দ্বীন ঃ

এক ঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত ও নবী-রাসূল প্রদর্শিত দ্বীন। আদম আ. থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত সর্ব যুগে আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন একই সূরে ধ্বনিত হয়েছে।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

"আমি নূহকে তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছিলাম। অতপর সে বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের ব্যাপারে আমি এক কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৫৯

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ ○

www.bjilibrary.com

"আমি কওমে আদের প্রতি তাদেরই জাতি হুদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে আমার জাতি ! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি ভুল পথ ছাড়বে না ?"–সূরা আল আরাফ ঃ ৬৫

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط

"সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার জাতিকে বলেছিল আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৭৩

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط

"আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি আমরা তাদেরই ভাই শুয়াইবকে পাঠিয়েছি। সে বলল, হে আমার জাতির লোকেরা ! আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৮৫

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে আমরা দেখতে পাই সব নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূল সূর ছিল আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করা এবং গাইরুল্লাহর প্রভুত্ব বর্জন করা।

দুই ঃ দ্বিতীয় দ্বীন হলো মানব রচিত দ্বীন। এই দ্বীন অসংখ্য ও অগণিত। যদিও মানব রচিত দ্বীন ভিন্ন ভিন্ন সূরে ও ভিন্ন ভিন্ন শ্লোগানে এসেছে। কিন্তু এর মূল সূর একই। এ জন্যেই বলা হয়েছে "আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা।" কুফরী মতবাদ মতাদর্শ যত ভিন্ন নামে বা ভিন্ন রূপেই উপস্থাপিত হোক না কেন মৌলিকভাবে তা একই পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ○ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلاَ وَاَغْلٰلاً وَّسَعِيْرًا ○ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ○ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

"আমি মানুষের সামনে দুটি পথ তুলে ধরেছি। একটি পথ আমার আনুগত্য মেনে চলার পথ অপরটি আমাকে অমান্য করার পথ। আমি কাফেরদের জন্যে তৈরী করেছি জিঞ্জির, কণ্ঠকড়া ও জাহান্নামের কঠিন

www.bjilibrary.com

ভয়াবহ শাস্তি। আর যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে তাদের জন্যে রয়েছে পবিত্র পানীয় যাতে কর্পূর মিশানো থাকবে, স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে সে পান করবে আর যত খুশী সেখানে এর শাখা-প্রশাখা বানাতে পারবে।"—সূরা আদ দাহর ঃ ৩-৬

আল্লাহ পাক তার এ দ্বীনকে নিছক দর্শন হিসেবে, কাগজী বিধান হিসেবে দেননি। আবার কোন অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মও এটা নয়। বরং এটা হলো আল্লাহর কাছে স্বীকৃত ও মনোনীত একমাত্র দ্বীন। কুরআন মজীদে রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি রাসূল পাঠিয়েছেন হুদা এবং দ্বীনে হক সহকারে অন্যান্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।"—সূরা আস সফ ঃ ৯

এখানে دِيْنِ حَقِّ বলতে ইসলামকে একমাত্র সত্য ও বাস্তবানুগ দ্বীন বলা হয়েছে, আর عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ বলতে মানব রচিত সকল আদর্শ, মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত দ্বীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব নবী-রাসূলগণ পুরোপুরি পালন করে গেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর এ কার্যক্রম তো সকল দুনিয়াবাসীর সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সফলভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আল্লাহর আইনকে বাস্তবভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। দুনিয়ার অন্য কোন মানব রচিত মতবাদ একদিনের জন্যেও তার মূল spirit সহ এ জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন কোন নজীর নেই। অথচ ইসলাম দীর্ঘদিন তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সহ এ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর ইন্তিকালের সাথে সাথে নবুওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আর কোন নবী আসবেন না, অথচ আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর দ্বীনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কে করবে এ দায়িত্ব পালন ? এ দায়িত্ব তাদেরই ওপর যারা আজ মুসলমান নামে পরিচিত। মুহাম্মাদ সা.-এর উম্মত বলে আমরা যারা গর্ববোধ করি, রাসূল সা.-এর রেখে যাওয়া দায়িত্বের বোঝা বইতে হবে তাদেরকেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকের নির্দেশ ঃ

www.bjilibrary.com

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে তোমরা লোকদের জন্যে সাক্ষী হও, আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

কেমন সাক্ষ্য রাসূল সা. দিয়েছিলেন? এ সম্পর্কে তার অন্যতমা সহচরী —প্রিয়তমা স্ত্রী বিবি আয়েশার এ উক্তিই যথেষ্ট যে, "কুরআনই রাসূল সা.-এর বাস্তব জীবন।" এ কুরআন তো শুধু আল্লাহ্, কিতাব, ফেরেশতা ও পরকালের ওপর ঈমান আনার জন্যেই নয় অথবা শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের নির্দেশ সম্বলিতও নয়। বরং এ হচ্ছে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। যার ব্যপ্তি ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর অঙ্গন পর্যন্ত। আল্লাহর তসবিহ-তাকদিস করার জন্যে তো ফেরেশতা এবং গোটা সৃষ্টিই রয়েছে। মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো ভিন্ন। যা আল্লাহর ভাষায় ঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط

"আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি পাঠাব।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

এ খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়েই আমরা দুনিয়াতে এসেছি। খলীফা হিসেবে আমাদের কাজ হলো আল্লাহর নির্দেশ মত নিজে চলতে হবে, মানুষের সমাজকে চালাতে হবে। খলীফা হিসেবে মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর ব্যাপারে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ঃ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط

"আমরাই তো তোমার প্রশংসাসহ তাসবিহ পড়ছি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

এর জবাবে আল্লাহ্ বলেছিলেন ঃ

اِنِّىْ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○

"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

অর্থাৎ ঐ তাসবিহ-তাকদিসের জন্যে মানুষকে পাঠানো হচ্ছে না। মানুষের সমাজে আল্লাহর আইন-কানুনকে জারি করার জন্যে তাকে পাঠানো হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহর খলীফার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে দ্বীন কায়েমের এ কাজে অংশগ্রহণ না করে উপায় নেই।

www.bjilibrary.com

এ দ্বীন যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর তা দুনিয়াতে বাস্তবায়নের কাজ করেছেন তাঁরই মনোনীত নবী-রাসূলগণ, কাজেই এটা সকল সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে। আল্লাহর দ্বীনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা পেয়েছি শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর মাধ্যমে। আর সেই কুরআন সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো ঃ لَارَيْبَ فِيْهِ –"এতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই।"

অন্যদিকে মানব রচিত মনগড়া দ্বীন, মতবাদ বা আদর্শ ; কখনও সন্দেহ-সংশয় মুক্ত হতে পারে না। এসব মতবাদের প্রবক্তারাও কখনো এ দাবী করতে পারে না। কারণ মতবাদ রচনা করতে যেয়ে তারা যে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের আশ্রয় নেয় তা একান্তই সীমাবদ্ধ। মানুষ বর্তমানকে দেখে, অতীত ইতিহাসকে সামনে রেখে কোন মতবাদ বা দর্শন রচনা করে। মানুষের জ্ঞান এতই সীমাবদ্ধ যে, বর্তমান যে অবস্থা যে চোখে দেখছে তার সঠিক বিশ্লেষণ করতেও সে সক্ষম নয়। আর ভবিষ্যত তো তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই মানব রচিত মতবাদ নির্ভুল ও সংশয় মুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর পরিচয় হলো ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج

"তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

যেহেতু আল্লাহ মানুষসহ সমগ্র বিশ্বজাহানের স্রষ্টা তাই মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল। তাই তার পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে তা মানব স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই একে বলা হয় "দ্বীনে ফিতরাত" বা স্বভাব ধর্ম। যুগ যুগ ধরে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যে কাজকে অন্যায় বলে আসছে ইসলাম সেই কাজগুলোকে অসৎকাজ বা "মুনকার" বলেছে। আর যা বিবেক-বুদ্ধির কাছে ভাল বলে পরিচিত ইসলাম তাকেই সৎকাজ বা "মারূফ" বলেছে। উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব এই মারূফের প্রতিষ্ঠা এবং মুনকারের প্রতিরোধ। আল্লাহ পাকের নির্দেশ ঃ

تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমরা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে আর করবে অন্যায়ের প্রতিরোধ।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

www.bjilibrary.com

এ কাজ কি ফরয ?

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ কাজকে আল কুরআনের পরিভাষায় বলা হয়েছে "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ"।—ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ۔

"যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের (আল্লাহদ্রোহিতার) পথে।"

—সূরা আন নিসা ঃ ৭৬

আরবী ভাষায় جُهْدٌ শব্দটি জিহাদের মূলধাতু। جُهْدٌ অর্থ চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো বা যথাসাধ্য চেষ্টা করা। اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থ আল্লাহর পথে চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। দুনিয়ার মানুষের জীবনযাপনের জন্যে যে পথ আল্লাহ নবী-রাসূলদের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহর পথ বলতে সেটাই বুঝায়। এ পথে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এ পন্থা অনুসরণ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা। যেখানে এর অনুসরণের সুযোগ নেই সেখানে সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করা।

আমাদের মধ্যে জিহাদ সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা রয়েছে। সাধারণত যুদ্ধকেই জিহাদ মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু যুদ্ধ জিহাদের একটা অংশ মাত্র। জিহাদকে বুঝতে হলে আমাদেরকে আল কুরআনের আলোকেই বুঝতে হবে। আল কুরআনের আলোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত কাজ-গুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. দাওয়াত ইলাল্লাহ
২. শাহাদাত আলান্নাস
৩. কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ
৪. ইকামাতে দ্বীন
৫. আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার।

এ পাঁচটি কাজের সমষ্টির নাম 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বা ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলনের কুরআনিক পরিচয় জানতে হলে এ পাঁচটি বিষয় সম্পর্কেই পরিষ্কার জানতে হবে।

www.bjilibrary.com

১. দাওয়াত ইলাল্লাহ

এ যমীন আল্লাহর। মানুষের স্রষ্টাও আল্লাহ। কাজেই মানুষের জীবনে ও আল্লাহর যমীনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। সব নবীর আন্দোলনের সূচনা হয়েছে দাওয়াতের মাধ্যমে।

সূরা আল আরাফে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন নবীদের দাওয়াত দানের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। এগুলো ছিল তাদের রবের পক্ষে থেকে সরাসরি নির্দেশ এবং তাদের দাওয়াতের মূল কথাও ছিল এক ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۔

"হে আমার জাতির লোকেরা ! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৫৯

শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর আন্দোলনেও তাঁকে প্রথম এভাবে মানব জাতিকে আল্লাহর দাসত্ব কবুলের আহ্বান জানাতে হয়। তাঁর জীবনের প্রথম গণভাষণের প্রধান বক্তব্য ছিল ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ـ قُوْلُوْا لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ۔

"হে আমার জাতি ! তোমরা ঘোষণা কর আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ নেই—তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।"

আল্লাহর দাসত্ব কবুল এবং গায়রুল্লাহর দাসত্ব বর্জনের আহ্বান জানানোর এ কাজটা আল কুরআনে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এসেছে সরাসরি নির্দেশ আকারে। যেমন সূরা নাহলের শেষ দুটি আয়াতে দাওয়াতের পদ্ধতি শিখাতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔

"ডাক তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে।"–সূরা আন নাহল ঃ ১২৫

কোথাও আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাজ ও পথের পরিচয় দিয়েছেন ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْاۤ اِلَى اللّٰهِ

"বলে দিন (হে মুহাম্মাদ!) এটাই আমার একমাত্র পথ, যে পথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮

www.bjilibrary.com

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ۝ وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۝

"হে নবী ! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।"–সূরা আহযাব ঃ ৪৫-৪৬

কোথাও আল্লাহ্ পাক এ কাজের প্রশংসা করেছেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

"আর সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় আর বলে যে, আমি মুসলমান।"
–হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৩৩

কোথাও উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা ভাল কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজে বাধা দিবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

এ দাওয়াতের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা যায় ঃ

এক ঃ সবাই তাওহীদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার এবং গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্ব পরিহারের আহ্বান জানিয়েছেন।

দুই ঃ তারা সমাজের খুঁটিনাটি সমস্যাকে তুলে না ধরে যেসব বড় বড় সমস্যায় জাতি জর্জরিত ছিল সেগুলোর শক্ত সমালোচনা করেছেন।

তিন ঃ দাওয়াত গ্রহণের প্রতিদান-প্রতিফল দুনিয়ায় এবং আখেরাতে কি হবে তা বলেছেন। পক্ষান্তরে এ দাওয়াত অস্বীকারের পরিণাম সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

মূলত নবী-রাসূলদের এ দাওয়াত ছিল তাদের নিজস্ব সমাজের আমূল পরিবর্তনের একটা বিপ্লবী আপোষহীন ঘোষণা। আর এ বিপ্লবী ঘোষণার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত সমাজের সুবিধাভোগীদের সাথে সংঘর্ষ।

২. শাহাদাত আলান্নাস

হযরত মুহাম্মাদ সা. যেমন সত্যের পথে আহ্বানকারী তেমনি তিনি সত্যের মূর্তপ্রতীক। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوْلاً لا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ ـ

"আমি তোমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষীরূপে।"
–সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ১৫

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

"আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪৫

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি জাতিরূপে গড়ে তুলেছি যাতে করে তোমরা গোটা মানবজাতির জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পার এবং রাসূল যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ط

"যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য রয়েছে সে যদি তা গোপন করে তাহলে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে?"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪০

শাহাদাত আসলে দাওয়াতেরই একটা বাস্তব রূপ। বাস্তব নমুনা পেশ করার মাধ্যমেই যুগে যুগে মানুষের সামনে এ দাওয়াত পেশ করেছেন একদিকে তাঁরা দ্বীনের দাওয়াত মৌখিকভাবে মানুষকে দিয়েছেন, অন্যদিকে মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের আমল-আখলাক গড়ে তুলেছেন।

www.bjilibrary.com

শেষ নবী মুহাম্মাদ সা. এ ব্যাপারে উত্তম ও পরিপূর্ণ আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর জীবনে এমন একটি কথাও তিনি বলেননি যা তাঁর বাস্তব জীবনে রূপ লাভ করেনি। শেষ নবীকে উত্তম আদর্শ হিসেবে—একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে তার উম্মাতকেও "দায়ী ইলাল্লাহ" হবার সাথে সাথে শুহাদা আলান্নাসের ভূমিকা পালনের তাকিদ এসেছে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। মক্কায় চরম প্রতিকূল পরিবেশে রাসূল সা. যে অল্প সংখ্যক সাথী পেয়েছিলেন তাঁরা নবীর দাওয়াত কবুল করে নিজেরাও দাওয়াতদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এ দাওয়াতের পক্ষে নিজেদেরকে বাস্তব সাক্ষী বা নমুনারূপে গড়ে তুলেন যার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন সূরায়ে ফুরকানের শেষ রুকূ'তে এবং সূরা মু'মিনূনের প্রথম রুকূ'তে।

মূলত এ ধরনের বাস্তব সাক্ষ্যদানকারী একদল লোক তৈরী হওয়া ছাড়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজের সাফল্য অসম্ভব।

৩. কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ

দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি যখন মৌখিক দাওয়াতের পাশাপাশি নিজের চরিত্র এবং কর্মে সেই দাওয়াতের বাস্তব সাক্ষ্য প্রদান করে তখন স্বভাবতই পারিপার্শ্বিক কায়েমী স্বার্থ তার আওয়াজকে স্তব্ধ করার জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। যখন যাবতীয় যুলুম, নির্যাতন, প্রলোভন হার মানে এবং সমাজের মানুষের ওপর দাওয়াত দানকারীর উন্নত চরিত্রের নৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তারা 'দায়ীকে' নিশ্চিহ্ন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরোধিতার জবাবে 'দায়ীকে' চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। লক্ষণীয় যে, মাক্কী জীবনে যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। মাক্কী জীবনের শেষের দিক সূরায়ে নাহল এবং সূরায়ে শুরার মাধ্যমে শর্ত সাপেক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হলেও প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করাকে উত্তম বলা হয়েছে। কিন্তু মাদানী জীবনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহদ্রোহী শক্তির যুলুম-নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। এরপরেই আসে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে এ সংঘাত এ সংঘর্ষ অনিবার্য। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ-

"যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৭৬

قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ

"ফেতনা-ফাসাদ মূলোৎপাটিত হয়ে দ্বীন পরিপূর্ণরূপে কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

"যুদ্ধ কর আহলে কিতাবদের সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করে না। (তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখ) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়।"–সূরা আত তাওবা ঃ ২৯

আল কুরআনের আলোচনায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ কাজকে যেমন আমরা ঈমানের অপরিহার্য দাবী রূপে দেখতে পাই তেমনি কিতালও ঈমানের দাবী পূরণের উপায় হিসেবে বিবৃত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف

"যারা ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে তাদের জান ও মাল আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। (এখন তাদের একমাত্র কাজ হলো) তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে জান এবং মাল দিয়ে, এ লড়াইয়ে তারা মারবে এবং মরবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১১

এ কিতালের নির্দেশ মূলত দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের সমাজ থেকে অশান্তির কারণ যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন করার জন্যেই।

৪. ইকামাতে দ্বীন

ইকামাতে দ্বীন অর্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায় কোন জনপদে আল্লাহর আইন চালু থাকা, আল্লাহর আইন অনুসরণ ও

www.bjilibrary.com

বাস্তবায়নের পথে বাধা না থাকা। কোন দেশে যদি ইসলামী অনুশাসন বা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত আইন চালু থাকে তাহলে কোন ব্যক্তি আল্লাহর আইন পুরোপুরি মানতে পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ জীবনের চাবিকাঠি যাদের হাতে মানুষ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। তারা যদি ইসলাম বিরোধী হয় তাহলে সেই সমাজের মানুষ ইসলাম অনুসরণের সুযোগ পায় না।

ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিপূর্ণ দ্বীন মানা তো দূরের কথা নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাতের দাবীও পূরণ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নামায আদায় হতে পারে কিন্তু কায়েম হয় না। অথচ নামায কায়েমের নির্দেশই দেয়া হয়েছে—আদায়ের নয়। আবার নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে, "নামায যাবতীয় অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে মানুষকে দূরে রাখে।" অর্থাৎ পূত-পবিত্র একটা সমাজ গড়াই নামাযের লক্ষ্য। তাও ব্যক্তি উদ্যোগে সম্ভব নয়। এমনিভাবে যাকাত আদায়ও সঠিক অর্থে ব্যক্তিগত হতে পারে না। রোযা তো এমন এক পরিবেশ দাবী করে। যা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্ভব নয়। হজ্জের ব্যাপারটা তো আরও জটিল। নামায, রোযা এবং যাকাত তো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে সঠিকভাবে হোক বা না হোক তবুও আদায় করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ছাড়পত্র ছাড়া হজ্জের সুযোগ বর্তমান ব্যবস্থায় না থাকায় ব্যক্তি ইচ্ছা করলেও হজ্জের ফরয আদায় করতে পারছে না।

এছাড়া সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধের কোন একটিও আমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনৈতিক জীবনে আমরা সুদ বর্জন করতে পারছি না। সমাজ জীবনেও বাঁচতে পারছি না উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা থেকে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না থাকলে ব্যক্তি জীবনে দ্বীনের অনুসরণ অসম্ভব। এ জন্যেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। সব নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিল দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা।

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ

"তিনি সেই সত্তা যিনি রাসূলকে পাঠিয়েছেন স্পষ্ট দ্বীন এবং হেদায়াতসহ যেন তিনি অন্যান্য সব মতবাদ ও মতাদর্শের ওপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا

وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

www.bjilibrary.com

"তিনি তোমাদের দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার প্রতি যে হেদায়াত ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি, আর সেই হেদায়াত যা আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসার প্রতি পাঠিয়েছিলাম। (সব নির্দেশের সারকথা ছিল যে,) তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে পরস্পরে দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।"–সূরা শুরা ঃ ১৩

শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআনে যা বলা হয়েছে তারও সারকথা এটাই।

৫. আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার

সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে বাধাদানের কাজ একটা সার্বক্ষণিক কাজ। সাধারণভাবে গোটা উম্মতে মুহাম্মাদীরই এটা দায়িত্ব।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

"আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যাদের ঈমান আছে, তারা নেক ও সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখে এবং কল্যাণের কাজসমূহে তারা তৎপর থাকে, এরা সৎ ও নেক লোক।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৪

একদিকে এ 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের' দায়িত্ব জনগণের পক্ষ থেকে আঞ্জাম দেবে তাদেরই আস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্র সরকার। অন্যদিকে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবেও তারা যার যার জায়গায় ও এলাকায় এ কাজ আঞ্জাম দেবে। কিন্তু সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে এ কাজের আঞ্জাম পাওয়াটাই শরীয়াতের আসল স্পিরিট।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط

"এরা তো ওসব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১

এখানে আমরা যে পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা করলাম এর সমষ্টির নামই ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ ছাড়া 'আজাবুন আলীম' থেকে বাঁচার আর কোন উপায় নেই।

www.bjilibrary.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط

"হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলবো না যা তোমাদেরকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারে ? তাহলো তোমরা ঈমান আন আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে জান এবং মাল দিয়ে।"–সূরা সফ ঃ ১০-১১

এ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ফরয। শুধু ফরয বললে বোধ হয় পূরা বলা যায় না। বরং বলা যায় এটা সব ফরযের বড় ফরয। কারণ এ ফরয আদায় না করলে অন্যান্য ফরয আদায় করা কখনোই সম্ভব হবে না।

কুরআনে বর্ণিত একথাগুলো ভালমত বুঝার জন্যে আমাদের সামনে মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার দায়িত্ব সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

এ দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর খলীফা। খেলাফতের এ দায়িত্ব পালন করতে হবে নিজের মনগড়া মত বা পথে নয় বরং আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতেই। আল্লাহর আইনকে জীবনের সর্বস্তরে চালু করতে হলে প্রয়োজন একটি সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টার। যে সুসংবদ্ধ জীবনের বাস্তব নমুনা আল্লাহর নির্দেশে পেশ করেছেন নবী এবং রাসূলগণ এবং যে কাজ সম্পর্কে আল কুরআনের ঘোষণার মূল কথাও দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম পরিচালনা এবং নেতৃত্বদান ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূল সা. তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগীতে এ বিপ্লবী আন্দোলনই পরিচালনা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের আন্দোলনের ব্যবস্থা রেখে গেছেন। নবী সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন ঃ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ। "উপস্থিত লোকদের অবশ্যই অনুপস্থিত লোকদের কাছে একথাগুলো পৌছাতে হবে।"

সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে পরিচয় দিতে হলে এ দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের তাকিদ কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে সরাসরি প্রমাণিত। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের রা. ইজমা রয়েছে। এ ইসলামী আন্দোলন নিছক কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয় বরং এমন আন্দোলন যার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে বাস্তবে কায়েম করা সব উম্মতে

মুহাম্মাদীর ঈমানের দাবী এবং যা আখেরাতে নাজাতের উপায়—যার কোন বিকল্প নেই। এ সম্পর্কে রাসূলে করীম সা.-এর অনেক হাদীস রয়েছে ঃ

"আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, এক লোক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন—আমাকে এমন কোন আমলের সন্ধান দিন যা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সমতুল্য। নবী সা. বললেন, এমন কোন আমল আমি পাই না যা জিহাদের সমতুল্য হতে পারে।

অতপর রাসূল সা. বললেন, মুজাহিদ যখন থেকে জিহাদের জন্যে যাত্রা করল তখন থেকে (তার বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত) তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকে। তুমি মসজিদে থেকে সর্বদা নামাযে লিপ্ত থাক, মুহূর্তের জন্যেও ক্ষান্ত না হও এবং রোযা রাখতে থাক, রোযা না ভাঙ্গ—এ রকম করতে পার কি ? ঐ লোক আরজ করলো, এমন কে আছে যে এ রকম করতে পারবে ?

আবু হুরাইরা রা. আরো বলেছেন, মুজাহিদ ব্যক্তির ঘোড়া দড়িতে বাঁধা থাকাবস্থায় দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি করে থাকে। তার পরিবর্তেও মুজাহিদের জন্যে সওয়াব লেখা হয়।

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি। জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় আত্মনিয়োগকারীর মর্তবা এমন, যেন কোন লোক সবসময় রোযা রাখেন এবং নামাযরত অবস্থায় থাকেন। অবশ্য কোন্ লোকের জিহাদ খাঁটিভাবে আল্লাহর রাস্তায় হবে তা আল্লাহই জানেন।"

জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ জামিন হয়ে আছেন—তার শহীদ অবস্থায় তাকে বিনা হিসেবে ও বিনা কষ্টে জান্নাতের অধিকারী করবেন অথবা পূর্ণ সওয়াব বা ধন-সম্পদ ও সওয়াব প্রদান করতঃ সালামতির সাথে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিবেন।

❐

www.bjilibrary.com

এ দায়িত্ব কি শুধু পুরুষের ?

এ পর্যন্ত আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের যে গুরুত্বের আলোচনা করেছি তা শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে ফরয এবং এটা ফরয প্রমাণিত হওয়ার পর এ থেকে দূরে থাকার আর কোন অবকাশই নেই। এ দায়িত্ব শুধু পুরুষেরই নয় বরং নারীরও।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী পরস্পর বন্ধু ও সাথী। তারা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিসেন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। এ মু'মিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ চির সবুজ-শ্যামল বাগিচায় তাদের জন্যে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বসবাসের জায়গা থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১-৭২

এখানে আমরা মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারি। এ দায়িত্ব শুধু পুরুষের নয় বরং নারীরও। সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে মু'মিন নারী মু'মিন পুরুষের সহযোগিতা করবে। এ সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই এর নির্দেশ এসেছে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এ সহযোগিতায় পুরস্কারের কথাও জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক।

www.bjilibrary.com

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِينَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِينَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِينَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَّالذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ○ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِينًا ○

"নিশ্চয়ই যেসব পুরুষ ও যেসব স্ত্রীলোক মুসলমান, মু'মিন, খোদার অনুগত সত্য পথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সম্মুখে অবনত, সদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী এবং অধিকমাত্রায় আল্লাহর স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্যে ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কোন মু'মিন পুরুষ ও কোন মু'মিন স্ত্রীলোকের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন, তখন সে নিজেই সেই ব্যাপারে আর কোন ফায়সালা করার ইখতিয়ার রাখবে। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হল।"

–সূরা আহযাব ঃ ৩৫-৩৬

اَلْخَبِيثٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ أُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

"খারাপ চরিত্রের স্ত্রীলোক খারাপ চরিত্রের পুরুষের যোগ্য এবং খারাপ চরিত্রের পুরুষ খারাপ চরিত্রের স্ত্রীলোকের যোগ্য। অনুরূপভাবে পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোক পবিত্র চরিত্রের পুরুষের জন্যে যোগ্য এবং পবিত্র চরিত্রের পুরুষ পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকের যোগ্য। তারা নিষ্কলংক সেইসব কথা থেকে যা লোকেরা রচনা করে থাকে। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রেযেক।"–সূরা আন নূর ঃ ২৬

www.bjilibrary.com

সূরা আন নূরের এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের সমমর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হচ্ছে পরিবার আর এ পরিবারে যেমন নারী তেমন পুরুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় মনে করা হয় পুরুষ যত অন্যায়ই করুক অথবা যত অসচ্চরিত্রেরই হোক না কেন নারীকে সতী সাধ্বী অবশ্যই হতে হবে। পুরুষের সাত খুন মাফ কিন্তু নারীকে তুলাদণ্ডে তার সতিত্বকে বিচার করতে হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে তা কখনও নয়। আর এটা কখনো বাস্তব হতে পারে না। চরিত্রহীন লোকের সমস্ত কার্যকলাপেই তার প্রকাশ ঘটে। যদি তার সাথে একটি ভাল চরিত্রের মেয়েকে জুড়ে দেয়া হয়, তবে দুনিয়াটা তার জন্যে জাহান্নাম হয়ে যায়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে যারা পুরুষকে "এমন তো হতেই হবে— কি আর আসে যায় সে তো পুরুষ মানুষ" এমনি মনোভাব তারাই পোষণ করে যারা নারীদেরকে মানুষই মনে করে না।

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু'তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সৃষ্টির ব্যাপারে বলেছেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ○ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج

"এ আকাশ ও সৃষ্টির ব্যাপারে, রাত দিনের আবর্তনে সেই বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে। যারা সৃষ্টি সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা করে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে হে খোদা তুমি কোন কিছু উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১

গোটা সৃষ্টি ব্যবস্থাই অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, সুদৃঢ় ও বৈজ্ঞানিক। সুতরাং যে সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নৈতিক অনুভূতি রেখেছেন, যাতে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে, তার নিকট তার এ পার্থিব জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করা সৎ ও নেক কাজের বিনিময়ে পুরস্কার ও পাপ কাজের বিনিময়ে শাস্তি না দেয়া কেমন করে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে ? এ দুনিয়াতে চলার ব্যাপারে নবী-রাসূলগণ যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকার সুযোগ নেই এবং আল্লাহ তার নবীদের মাধ্যমে ভাল কাজের ভাল ফল এবং মন্দ কাজের পরিণাম-পরিণতির সম্পর্কে যা ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। ঈমানদারেরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলবে ঃ

www.bjilibrary.com

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّى لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

"হে আল্লাহ! তুমি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লজ্জার সম্মুখীন করো না। এটা নিসন্দেহ যে, তুমি কখনোই ওয়াদা খেলাফকারী নও। জবাবে আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে কারও কাজকে নষ্ট করব না। পুরুষ হোক কি স্ত্রী হোক সবাই সমজাতের লোক, কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে, আমারই জন্য লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দিব যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, আল্লাহর নিকট এই তাদের প্রতিফল ; আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র আল্লাহর কাছেই পাওয়া যেতে পারে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৪-১৯৫

আমাদের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। এখানে স্ত্রী-পুরুষে কোন পার্থক্য নেই। যে উপরোক্ত কাজ করবে সে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ যেমন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই স্রষ্টা তেমনই নবী-রাসূলগণও শুধু পুরুষ জাতিকে পথ দেখানোর জন্যে আসেননি। বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য তাঁরা দ্বীনের প্রকৃতরূপের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কুরআন মজিদেও আমরা দেখতে পাই আল্লাহ পাক اَيُّهَا النَّاسُ "হে মানব সমাজ।" অথবা يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "হে ঈমানদারগণ!" বলে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ এর মধ্যে যেমন পুরুষ জাতি রয়েছে তেমনি রয়েছে নারী জাতিও। আর এটা তো অস্বাভাবিক যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মানব সমাজ গড়ার যে বিধান আসলো তা কেমন করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীকে বাদ দিয়ে হতে পারে। নারী এবং পুরুষ মিলেই তো সমাজ। প্রত্যেককেই মৃত্যুর পরে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং সেখানে

www.bjilibrary.com

তাকে দুনিয়ার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে হবে। এ বিষয়টিকে রাসূল সা. নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক এবং প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"

যদিও সমাজে পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র ভিন্ন কিন্তু যার যার ক্ষেত্রে সে দায়িত্বশীল। এখানে সন্তান-সন্ততি, চাকর-বাকরসহ জীবন যাপনের যে সমস্ত জিনিস মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে, যার ওপর মানুষের কর্তৃত্ব খাটে সব কিছুরই সে রক্ষক। মানুষের এ দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূল সা. তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, "সাবধান ! তোমাদের অধীনস্তদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমাদের ওপর বর্তায় এবং তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকে তুমি কিভাবে ব্যবহার করছ সে সম্পর্কে তোমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই এ দায়িত্বের আঞ্জাম দিতে হবে খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি নিয়েই। সবকিছুর ওপর নিজের কর্তৃত্ব নয়—যথেচ্ছাচার নয় বরং আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়িত করতে হবে। যেহেতু আল্লাহর আইনকে আল্লাহর যমীনে বাস্তবায়িত করার দায়িত্বের (Guidance) এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানব সমাজেই। আর এক একটি পরিবার নিয়েই গঠিত হয় সমাজ এবং সেই পরিবারের দায়িত্ব প্রধানত এবং বাস্তবভাবেই নারীর ওপর থাকে এ জন্য ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে নারীর কোন অংশে কম নয়। নারী গৃহের রাণী। তার ইচ্ছামতই সংসার চলে। যদিও আইনত পুরুষ পরিবারের কর্তা ব্যক্তি কিন্তু সে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে বাইরের কাজ-কর্ম এবং উপার্জনের তাগিদে। ঘরের সন্তান-সন্ততি রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব থাকে নারীর ওপর। এ দায়িত্ব সে কিভাবে পালন করবে—কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে পরিবার গঠন করবে তা নির্ভর করে তার মানসিকতার ওপর। যে মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠবে সেই অনুযায়ীই চলবে সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র। কাজেই এক্ষেত্রে বলা যায় ইকামাতে দ্বীনের সিংহ ভাগ কাজ মেয়েদের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মজীদে সূরা লুকমানে সন্তানদের কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে তার রূপরেখা দিয়েছেন। ছোট বেলা থেকে সন্তানদেরকে শিরক ও বিদআত সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান, আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা দান, বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র হতে শেখানো, দান-খয়রাতে উদ্বুদ্ধ করা, ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজে বাধাদানে উদ্বুদ্ধ করা। এগুলো তো মায়েদেরই কাজ। কোন জোর-জবরদস্তি

www.bjilibrary.com

করে নয় বরং প্রতিনিয়ত সার্বক্ষণিক কাজের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ মা-ই পারেন তার সন্তানের সামনে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরতে। খোশ-গল্পের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে পারেন জিহাদী প্রেরণা। বড় বড় মনীষীদের জীবনী, নবী-রাসূলদের গল্প, সাহাবায়ে কেরামদের কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে পারেন তাদের বিপ্লবী জীবন। সৃষ্টি করতে পারেন অন্যায়ের সাথে আপোষহীনতার—আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা। কিন্তু তার জন্যে শর্ত হলো মা'কে হতে হবে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। জবাব দেবার যোগ্যতা থাকতে হবে তার সন্তানের ছোট্ট অথচ অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নসমূহের। আর এ জন্যে প্রয়োজন নির্ভুল জ্ঞানের, যে প্রয়োজনকে সামনে রেখেই আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল সা.-এর ওপর প্রথম যে ওহী নাযিল করলেন সেটি ছিল ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

"পড় ! তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে।"–সূরা আল আলাক ঃ ১-২

অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের তাগিদ এসেছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে। সে কোন্ জ্ঞান ? বস্তুবাদী জগতের নফসের লালসা মেটানোর কলা-কৌশল আয়ত্ত করার বা আল্লাহদ্রোহিতার কায়দা-কানুন শেখার জ্ঞান নয়। যে জ্ঞান মানুষকে তার প্রকৃত স্রষ্টাকে চিনতে সাহায্য করে সেই জ্ঞান। হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٌ

"জ্ঞানার্জন প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের জন্যে ফরয।"

বলা হয়েছে ঃ 'জ্ঞানার্জনের জন্যে প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও।' আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের কোন সুযোগই নেই। বরং যা শেখানো হয়েছে তা ইসলামের বিপরীত। অন্য বিষয়ের কথা বাদ দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের কথাই ধরুন। এ ইতিহাস আসলে রচিত হয়েছে অমুসলিমদের হাতে। ফল যা দাঁড়িয়েছে তাহলো এই যে, ইসলামের মূল Conception-এর বিপরীত জিনিসই এখানে চিত্রিত হয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্য বইতে মুহাম্মাদ সা.-এর জীবনীকেও যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা যে কোন মুসলমানের জন্য দুঃখজনক। কাজেই এ গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জ্ঞানার্জনের মূল লক্ষ্য হাসিল হবে না। আবার এ শিক্ষাগ্রহণ করলেও চলবে না। এ শিক্ষার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণের চেষ্টা করতে হবে।

www.bjilibrary.com

আমাদের দেশে পুরুষদের জন্যে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। মসজিদ-মক্তব, সভা-সেমিনার ইত্যাদি থেকে তারা কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞান পেতে পারে। আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলোতে শুধু পুরুষেরই পড়ার সুযোগ রয়েছে। (অবশ্য বর্তমানে কিছু মহিলা মাদ্রাসা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে)। কাজেই মহিলারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এর ফলে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে বড় বড় আলেম বা পীর সাহেবদের ঘরেও চরম দুরবস্থা। তাদের বিবিরা হয়তো পাঞ্জেগানা নামাযও আদায় করেন না। হারাম-হালাল, পাক-নাপাকের ন্যূনতম মাসয়ালাও তারা জানে না। তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের মায়ের মধ্যে কোন আদর্শ দেখতে পায় না। পিতা হয়তো ব্যস্ততার কারণে ঘরের দিকে নজর দিতে পারেন না ফল যা হবার তাই হয়। জোর করে হয়তো তাদের ওপর নামায-রোযা ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সেগুলোর প্রকৃত তত্ত্ব না জানার ফলে হয়তো আল্লাহর ভয়ে না হয়ে পিতার ভয়ে হয়। অতএব বড় হলে বা পিতার চোখের আড়ালে গেলে আর সেই ইমেজটুকুও থাকে না।

অপর দিকে যে সমস্ত মায়েরা উগ্র আধুনিকা তারাও দ্বীনের জ্ঞানের অভাবে তাদের সন্তানের সামনে সঠিক আদর্শ পেশ করতে পারছেন না। মায়ের সোসাইটির অনুকরণে তারাও তেমনিভাবেই গড়ে ওঠে। আর যেসব শিক্ষিতা মায়েরা মোটামুটি ধর্ম পরায়না, ব্যক্তি জীবনে নামায-রোযা করেন, শালীনতার মধ্যে থাকেন—তারা তাদের সন্তানদেরকে নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে ভালভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। কিন্তু যখনই সে সন্তান ঘরের বাইরে পা রাখে তখন যেসব বন্ধু-বান্ধবদের পরিবেশ পায় তা তাকে করে তোলে উচ্ছৃঙ্খল। আমি খুব নিকট থেকে এ রকম কিছু মহিলাকে জানি। একজন উচ্চ শিক্ষিতা, বিত্তবান মহিলা। একমাত্র কন্যা তার। আশার শেষ নেই। সবদিক থেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে চান তিনি তার কন্যাকে। নিজে ইসলামের বিধি-নিষেধ পুরোপুরি মেনে না চললেও শালীনতায় বিশ্বাসী। মেয়েটি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। পরিচিত হচ্ছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে। রেডিও, টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তার অবাধ যাতায়াত। মা এতে খুশী। কারণ তিনি অনুভব করেন এটা তার মেয়ের যোগ্যতার পরিচয়। একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন যে, মেয়ে ওড়না পরতে অস্বীকার করছে। কারণ তার বান্ধবীরা কেউ ওড়না পরে না। এমনি আরও অনেক কিছু তিনি আবিষ্কার করলেন যা তিনি কখনও কল্পনাও করেননি। মুষড়ে পড়লেন তিনি।

এমনি হাজারো ঘটনা অহরহ কানে আসে। মা-বাবা সৎ হলেও ছেলে মেয়েদেরকে সে রকম পাচ্ছেন না। কারণ সমাজ না গড়লে—সব মা-বাবা

www.bjilibrary.com

তার ছেলেমেয়েদেরকে আদর্শ না শেখালে সবাই একযোগে গোল্লায় যাবে। এই তো সেদিন এক অধ্যাপিকা বলছিলেন, আপা আমার ছেলেকে "মাসূদ রানা" বই পড়তে দেখে খুব কেঁদেছি। এ বই কেন সে পড়ছে জিজ্ঞেস করলে সে বলল "এই বই না পড়লে বন্ধুরা বলে, তুমি কিছুই জান না।" এমনি সমস্যা আজ আমাদের সবার কম-বেশী রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের দায়িত্ব অনেক বেশী।

আজ আমাদের সমাজে মহিলারা নিষ্ক্রিয়তা নয়ই বরং ইসলাম বিরোধী আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তারা পুরুষের চেয়েও সক্রিয়। এটা বর্তমান আধুনিক খোদাবিমুখ শিক্ষার ফল। আল্লাহর আইনকে পর্যন্ত তারা রদবদল করে ফেলতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় কিছুতেই ইসলাম প্রিয় মহিলারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আল্লাহ্ অবশ্যই এ বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। তখন তো আমরা একথা বলে রেহাই পাব না যে, আমাদের স্বামীরা তো দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রত্যেক নারীকেই তার নিজ কাজের হিসেব নিজেকেই পেশ করতে হবে। প্রত্যেক নারী কিয়ামতের দিন নিজের কবর থেকেই ওঠবে। তখন একথা বলে কেউই রেহাই পাবে না, "হে আল্লাহ ! আমার হিসেব আমার স্বামীর কাছ থেকে গ্রহণ কর। কেননা জন্মগতভাবেই নারী এবং পুরুষের মর্যাদা সমান।"

আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

"হে জনগণ ! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, এ থেকেই তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং এ উৎস থেকেই বহু সংখ্যক পুরুষ-স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَافَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ

مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

"আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অপরের মোকাবেলায় যা কিছু বেশী দিয়েছেন তোমরা তার লোভ করো না। যা পুরুষেরা অর্জন করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে। আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে তদনুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ লাভের জন্যে প্রার্থনা করতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩২

اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ
فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَقٰتَلُوا
وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

"আমি তোমাদের মধ্যে কারো কোন কাজকে নষ্ট করে দিব না। পুরুষ হোক কি স্ত্রী—তোমরা সবাই সমজাতের লোক। কাজেই যারা একমাত্র আমার জন্যে নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই জন্যে লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সকল অপরাধ আমরা মাফ করে দিব এবং তাদের আমি এমন বাগিচায় স্থান দিব যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। আল্লাহর নিকট এটাই তাদের প্রতিফল ; আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র আল্লাহর কাছেই পাওয়া যেতে পারে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫

❐

www.bjilibrary.com

অতীত যুগের মহিলাদের ভূমিকা

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ দায়িত্ব শুধু আজকের যুগের মহিলাদের জন্যেই ফরয নয় বরং অতীতে মহিলারা এ দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন। তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে তাদের বিপ্লবী ভূমিকা, সমাজ সচেতনতা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা এ ভূমিকা পালন করে আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এক স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সবার জীবনী আমরা সঠিকভাবে জানতে পারিনি আবার যা-ও জেনেছি এ ক্ষুদ্র পরিসরে তাদের সবার জীবনী আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে আমরা কতিপয় মহিলার বিপ্লবী ভূমিকা আলোচনা করছি।

মুহাম্মাদ সা.-এর পূর্বে

বিবি আছিয়া

বিবি আছিয়া ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। সেই সমাজে ফেরাউনের পরিচয় শুধু সম্রাট হিসেবেই ছিল না বরং সে নিজে ছিল খোদায়ী দাবীদার। সেই ফেরাউনের সমাজে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন মূসা আ.। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া প্রখর বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন হক এবং বাতিলের পার্থক্য। তিনি ঈমান এনেছিলেন মূসা আ.-এর আনীত দ্বীনের প্রতি আর অস্বীকার করেছিলেন তার স্বামীর মনগড়া আইনকে। এটা কম বড় হিম্মত এবং সাহসের ব্যাপার ছিল না। তার সামনে ছিল দুটি দিক। এক দিকে তিনি ফেরাউনের কর্তৃত্ব মেনে নিলে সম্রাজ্ঞী হিসেবে সে সমাজের যাবতীয় সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারতেন, অন্য দিকে সত্যের পথ—যা মেনে নেয়ার ফল দুনিয়াতে ছিল ভয়াবহ, কিন্তু পরকালীন মুক্তি এতে নিহিত ছিল। মহিয়সী মহিলা দুনিয়ার কোন সুখ-সম্ভোগের পরোয়া না করেই মেনে নিলেন সত্যকে। যার ফলে তাঁকে সইতে হয়েছে দুঃখ-যন্ত্রণা। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে কিন্তু বাতিলের কাছে তিনি মাথা নত করেননি।

বিবি হাজেরা

বিশ্ব নেতা হযরত ইবরাহীম আ.-এর যোগ্যতমা সহধর্মিনী বিবি হাজেরা। আমরা তাঁকে দেখতে পাই আরবের মরু প্রান্তরে। ইবরাহীম আ. আল্লাহর

www.bjilibrary.com

নির্দেশে শিশু পুত্র ইসমাঈল আ. সহ তাঁকে রেখে আসছেন জনমানবহীন মক্কার মরুপ্রান্তরে। সাথে শুধু এক পুটুলী খেজুর আর এক মশক পানি। ইবরাহীম আ. যখন তাঁদেরকে রেখে ফিরে আসছেন বিবি হাজেরা তাঁর পিছু পিছু আসছেন আর জিজ্ঞেস করছেন, "আপনি কি আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন ?" ইবরাহীম আ. কোন কথা বলেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আল্লাহর নির্দেশে এমন করেছেন ?" তিনি শুধু বললেন, "হাঁ।" বিবি হাজেরা নিশ্চিত হলেন। বললেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে ধ্বংস হতে দিবেন না। এ কত বড় প্রত্যয়—কত দৃঢ় ঈমান ! সে ঈমানের অধিকারী হয়েই কেবল স্বামীকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে, আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে সাহায্য করা যায়। এরপরে কুরবানীর ঘটনা—সে তো আরও চমকপ্রদ। মরুর বুকে তিলে তিলে গড়ে তোলা একমাত্র পুত্র ইসমাঈল আ.। আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ইবরাহীম আ. সেই পুত্রকে নিয়ে চললেন কুরবানী করার জন্যে। সহাস্য বদনে তুলে দিলেন তিনি পুত্রকে স্বামীর হাতে। কেননা তিনি জানতেন তাঁর স্বামী সত্যিই আল্লাহর নবী।

ইসমাঈল আ. সে-ও উপযুক্ত মায়ের বাহাদুর ছেলে। আল্লাহর রাহে কুরবানীর কথা শুনে খুশীতে চললেন পিতার সাথে। এমন মা না হলে এ রকম ছেলে কখনো হয় না। মা এবং স্ত্রী হিসেবে এমন ভূমিকা পালন করতে না পারলে কেমন করে আল্লাহর নবী আল্লাহর এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন ? আর প্রতিষ্ঠিত হতো আল্লাহর দ্বীন ? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তাঁদেরকে পুরস্কৃত করলেন দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়, আবে জমজম সহ সমস্ত মক্কার ধূলিকণা তাঁদের স্মৃতি বহন করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ্জের সময় স্মরণ করে সে ইতিহাস। কুরবানীর মাধ্যমে গোটা মুসলিম বিশ্বের সমস্ত মানুষ শপথ নেয় এমনি করে সর্বস্ব আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেয়ার।

রাসূলে করীম সা.-এর যুগে

বিবি খাদিজা রা.

বিবি খাদিজা শুধু শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর স্ত্রীই ছিলেন না, তিনি তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম কর্মী—প্রথম মুসলমান। সেই অন্ধকারময়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে একজন মহিলার পক্ষে সত্যকে চিনতে পারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রখর প্রজ্ঞারই পরিচয় বহন করে।

www.bjilibrary.com

তিঁনি খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, অধপতিত এ জাতিকে সঠিক পথে চালিত করতে হলে নবীর এ আন্দোলন শুধু পুরুষের যোগদানই যথেষ্ট নয়, নারী সমাজকেও তার সাধ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে—সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। যে পথ সেদিন পুরুষের জন্যেও কিছু দুর্গম, এই মহিয়সী মহিলা সেই পথ গ্রহণ করেছিলেন স্বেচ্ছায়।

দিনের পর দিন তিনি হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান-মগ্ন স্বামীর খাদ্য-পানীয় যুগিয়েছেন সন্তুষ্ট চিত্তে। এরপর প্রথম ওহী নাযিলের সময় হুজুর সা. জিবরাঈল আ.-কে দেখে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লে খাদিজা সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ঃ

"হযরত আয়েশা রা. বলেন, আখেরী নবীর ওহীর সূত্রপাত হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যা স্বপ্নে দেখতেন তা সত্য সত্যই বাস্তবে ঘটতো। এরপর তিনি নির্জনবাস শুরু করেন। খাদ্য পানীয় নিয়ে তিনি চলে যেতেন হেরা পর্বতের গুহায়। সেখানে আল্লাহর ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করতেন। রসদ শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার ফিরে আসতেন খাদিজা রা.-এর কাছে। আবার খাদ্য সামগ্রী নিয়ে হেরা পর্বতে চলে আসতেন। ইতোমধ্যে একদিন জিবরাঈল আ. তাঁর নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ "পাঠ করুন।" তিনি জবাব দিলেন, "আমি পড়তে জানি না।" একথা শুনে ফেরেশতা তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন ঃ "পড়ুন।" তিনি বললেন ঃ "আমি তো পড়তে পারি না।" ফেরেশতা দ্বিতীয়বার আলিঙ্গন করে একই কথা বললেন। তিনি আগের মতই জবাব দিলেন। তৃতীয়বার ফেরেশতা তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, "পড় তোমার প্রভুর নামে।" এরপর রাসূল সা ভীত কম্পিত অবস্থায় ঘরে ফিরে এলেন এবং খাদিজাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। হযরত খাদিজা রা. বললেন, "আপনি ভীত হবেন না। আল্লাহ্ আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না। আপনি মৈত্রী স্থাপন করেন, অক্ষম ও দুঃস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদের আশ্রয় দেন এবং কষ্টের মধ্যে হলেও সত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।" এরপর খাদিজা রা. তাকে তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইবনে নওফেল ঈসায়ী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। সে সময় তিনি দৃষ্টিশক্তি রহিত বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। হযরত খাদিজা রা. তাঁকে বললেন, হে আমার চাচার পুত্র, আপনার ভাইয়ের ছেলের কথা শুনুন। তিনি বললেন, হে আমার ভাইয়ের পুত্র, তুমি কি দেখেছ? রাসূলে করীম সা. ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলে ওরাকা বলেন ঃ মূসার ওপর এ নামুসই অবতীর্ণ হয়েছিল। আফসোস আমি যদি

www.bjilibrary.com

সে সময় জীবিত থাকতাম এবং আমার শক্তি থাকতো যখন তোমার জাতি তোমাকে নির্বাসিত করবে। রাসূলে করীম সা. বললেন, তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে ?

ওরাকা জবাব দিলেন ঃ "হ্যা এটা যখন কারও ওপর নাযিল হয় তখন দুনিয়া তার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দেয়। আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম তাহলে তোমায় সাহায্য করতাম।" এ ঘটনার কিছুদিন পরেই ওরাকা ইন্তেকাল করেন।

এ বিপ্লবী কালেমাকে সে যুগের কায়েমী স্বার্থবাদীরা সহ্য করেনি কিন্তু খাদিজা রা. তাতে একটুও ভয় পাননি বরং সুখে-দুঃখে সর্বপ্রকার নির্যাতনে তিনি ছিলেন শেষ নবীর সার্বক্ষণিক সহযোগী। এমনকি শেবে আবু তালিবে বন্দী অবস্থায়ও তিনি তাঁর সাথে ছায়ার মত ছিলেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিরুদ্ধবাদীদের কাছ থেকে তিনি যে আঘাত পেতেন খাদিজা রা.-এর সান্নিধ্যে এলে তা দূর হয়ে যেত।

আদর্শের প্রতি শুধু মৌখিক বিশ্বাসই নয় বরং শেষ নবী উপস্থাপিত আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্যে অকৃপণ হাতে তিনি নিজের অঢেল সম্পদ ব্যয় করে সকল যুগের মানুষের জন্যে এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। মানুষ শুধু আমানতদার মাত্র। আমানতকে সে কিভাবে ব্যয় করেছে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে মহান মালিকের দরবারে এবং সে সম্পদ ব্যয় করতে হবে আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তথা মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যে।

আল্লাহর নবীর এ জীবন সঙ্গিনী প্রচুর বিত্তের মালিক হয়েও নিজ হাতে ঘরের কাজ করতেন। নিজ হাতে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। বিপ্লবের কাজে প্রত্যক্ষভাবে রাসূলে করীম সা.-কে সাহায্য-সহযোগিতা করার পর যে সময় পেতেন তা তিনি সাংসারিক কাজে ব্যয় করতেন। একদিন রাসূলে করীম সা.-এর কাছে জিবরাঈল আ. উপস্থিত ছিলেন। জিবরাঈল আ. বললেন ঃ খাদিজা থালায় করে কিছু নিয়ে আসছেন। আপনি তাঁকে আল্লাহ এবং আমার সালাম পৌঁছে দিন।

খাদিজা রা.-এর ওফাতের পর নবী করীম সা. তাকে স্ত্রী হিসেবে যতটুকু স্মরণ করতেন তার চেয়ে বেশী স্মরণ করতেন প্রথম মুসলমান ও শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে। কোন ভাল জন্তু যবেহ করা হলে তিনি হযরত খাদিজার বান্ধবীদের বাসায় তার গোশত পাঠিয়ে দিতেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আয়েশা রা. একদিন অনুযোগ করে বলেছিলেন ঃ "আপনি এমন এক বৃদ্ধার কথা স্মরণ করছেন যিনি জীবিত নেই। আল্লাহ্ আপনাকে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।" নবী করীম সা. জবাব দিয়েছিলেন, "কখনো না। মানুষ যখন আমার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে, তখন খাদিজা এর সত্যতা স্বীকার করেছে। তারা বিধর্মী ছিল কিন্তু সে ইসলাম কবুল করেছিলো। আমার যখন সাহায্যকারী ছিল না সে আমাকে সাহায্য করেছে।"

হযরত সুমাইয়া

প্রচলিত বংশ মর্যাদার সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সুমাইয়া নীচু মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন আবু হোযায়ফা বিন মুগীরা মাখজুমীর কৃতদাসী। চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে তিনি আরবের যে কোন শরীফ মহিলার চেয়ে কম ছিলেন না। তিনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের চেয়ে প্রিয় বস্তু দুনিয়ায় আর কিছু নেই। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আম্মারের মা। আর আম্মার ছিলেন ইসলামের প্রথম মসজিদ স্থাপনকারী।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের মা সুমাইয়া রাসূল সা.-এর রিসালাতে আস্থা স্থাপন করে মুসলমানদের সংখ্যা সাত এ উন্নীত করেন। এ নতুন প্রচারিত দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস আনার পরিণাম তিনি জানতেন। কিন্তু কোন ভয়-ভীতিই তাকে এ পথ থেকে টলাতে পারেনি। তাঁর ওপর নেমে এসেছে নির্যাতনের ষ্টীমরোলার। কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে স্বামী এবং পুত্রকে সাথে নিয়ে তিনি অটল রইলেন সত্যের পথে। নির্যাতন ভোগ করে স্বামী ইয়াসীর মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু তাতেও দমলেন না তিনি।

মক্কার কাফের দল তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা সুমাইয়াকে শুইয়ে দিত তপ্ত বালুর ওপর। মাথার ওপর প্রদীপ্ত সূর্য। এ অবস্থায় কেটে যেত সারাদিন। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়ে এনে এ নতুন দ্বীন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয়া হতো। পরদিন এসে তারা নিরাশ হতো। আবার শুরু হতো নির্যাতন। বাড়িয়ে দিত তার কষ্টের মাত্রা আরো। রাসূল সা. ব্যথিত হতেন। সুসংবাদ দিতেন জান্নাতের।

একদিন নির্যাতন ভোগ করে সুমাইয়া ফিরেছেন পর্ণ কুটিরে। আবু জেহেল তাঁর ঘরে এসে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। কিন্তু তাতেও তার রাগ

পড়লো না। একটা বর্শা দিয়ে আঘাত করলো সুমাইয়ার বুকে। দুশমনের আঘাতে শহীদ হলেন তিনি। সুমাইয়াই ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে প্রথম শহীদ। হিজরতের আগেই ঘটেছিল এ ঘটনা।

হযরত আয়েশা

হযরত আয়েশা রা. ছিলেন হযরত আবু বকর রা.-এর কন্যা এবং মুহাম্মাদ সা.-এর স্ত্রী। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. রাসূল করীম সা.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির চার বছর পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে রাসূলে করীম সা.-এর সাথেই তাঁর বিয়ে হয়। নবী করীমের সাথে 'নয়' বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পর তিনি বিধবা হন। এ নয় বছরে তিনি অর্জন করেছিলেন দ্বীনের প্রকৃত ইলম। যে ইলমের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তার প্রখর ব্যক্তিত্ব আর অন্যায়ের সাথে আপোষহীন ইস্পাত কঠিন চরিত্র। তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানের এক সুউচ্চ পাহাড়। পুরুষ-নারী, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই তাঁর কাছে আসতো আর অত্যন্ত নিরহঙ্কারভাবে তিনি জ্ঞান বিতরণ করতেন।

কুরআন এবং হাদীসের তিনি ছিলেন পণ্ডিত। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে রায় প্রদান করতেন। ইসলামী শরীয়াত, আহকাম এবং আকীদা সম্পর্কে তিনি খুব সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে না পেরে অনেক পণ্ডিত তাঁর কাছে আসতেন। তাঁরই সময়ে ইবনে আবী সাঈম তাবেয়ী প্রত্যেক নামাযের পর দীর্ঘ মুনাজাত করতেন। হযরত আয়েশা রা. এটা জানতে পেরে তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "সপ্তাহে একদিন এবং বেশীর পক্ষে তিন দিনের বেশী বক্তৃতা করবেন না। মুনাজাত সংক্ষেপে করবেন। কাব্যিক ভাষায় মুনাজাত করার দরকার নেই। দীর্ঘ বক্তৃতা, উপদেশ এবং দোয়ার দ্বারা মানুষকে পেরেশান করার নিয়ম আল্লাহর রাসূল এবং তার সাহাবীদের ছিল না।"

ফযরের নামাযের সময় দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও শুধু দু-রাকাআত সুন্নাত এবং দু-রাকাআত ফরয হওয়ার তাৎপর্য অনেকে বুঝাতে পারেননি। অবশেষে একদিন আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ফযরের নামাযে দীর্ঘ কিরাত পড়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে বেশী নামায রাখা হয়নি।

আসর ও ফযরের নামাযের পর অন্য কোন নামায না পড়ার জন্য হযরত ওমর রা. বর্ণিত হাদীসের মর্ম গ্রহণে অনেকে অপারগ হয়ে তার নিকট

www.bjilibrary.com

আসেন। হযরত আয়েশা রা. এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, সূর্যাস্ত এবং সূর্যদয়ের সময় নামায আফতাব পোরস্তদের সাথে সামঞ্জস্যশীল এ জন্য এটা নিষেধ করা হয়েছে।

এমনিভাবে বহু জটিল তথ্যের সমাধান তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশালতা সম্পর্কে ইসলামী দুনিয়ার পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যে মত পোষণ করেন তার দু-একটি এখানে উদ্ধৃত হলো।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা. বলেন, তাঁকে কঠিন বিষয়বস্তু জিজ্ঞেস করে কিছু তথ্য না পেয়ে আমি কখনো ফিরে আসিনি।

ইমাম জুহরী বলেন ঃ আয়েশা রা. শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবীরা বহু কিছু তাঁর কাছ থেকে আহরণ করেছেন। সকল নারী-পুরুষের জ্ঞান একত্রিত করলেও আয়েশার জ্ঞান প্রশস্ততর হবে।

ওরওয়া বিন জুবায়ের বলেন ঃ কুরআন, ফারায়েজ, হালাল-হারাম, ফিকাহ, ইতিহাস, গোত্র পঞ্জি এবং চিকিৎসা বিদ্যায় হযরত আয়েশার সমতুল্য কেউ নেই।

তিনি খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন। জঙ্গে জামালের সময় তিনি তেজোদীপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রাসূলে করীম সা.-এর জিন্দেগীকালে মহিলারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। পরবর্তীকালে নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে বিবি আয়েশা রা. মসজিদে নামায পড়ার বিপক্ষে মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, রাসূলে করীম সা. যদি জানতেন যে, মেয়েদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তাহলে তিনিও বনী ইসরাঈলের মেয়েদের মতো মুসলমান মেয়েদের মসজিদে যেতে বারণ করে দিতেন।

শিরক, বিদআত ও অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ বন্ধের জন্যে তিনি খুব সতর্ক ছিলেন। তখন কা'বা শরীফের গিলাফ প্রতি বছর খুলে দাফন করা হতো। মানুষ যাতে এ পবিত্র ঘরের চাদর ছুঁতে না পারে তার জন্যেও ব্যবস্থা নেয়া হতো। হযরত আয়েশা রা. এর কঠোর প্রতিবাদ করেন। তিনি কা'বার হেফাজতকারীকে বললেন, এটা যুক্তিসংগত নয়। যখন গিলাফ খুলে ফেলা হয়েছে তখন যে কোন লোক তা ব্যবহার করতে পারে। তুমি কেন এটা বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করে দাওনি ?

তিনি কখনো নিজের প্রশংসা শুনতে রাজি ছিলেন না। প্রশংসা করতে পারেন এ জন্য অন্তিমকালে দেখা করার অনুমতি পর্যন্ত দিতে চাননি। তিনি

www.bjilibrary.com

ইন্তেকালের আগে বলতেন, "আফসোস আমি যদি জন্মগ্রহণ না করতাম। হায়! আমি যদি পাথর হতাম, আমি যদি মৃত্তিকা খণ্ড হতাম ! কত বেশী ভয় আখেরাতের এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহির !

তাঁর স্বাস্থ্যের কথা কেউ জানতে চাইলে তিনি বলতেন, "আলহামদুলিল্লাহ, ভালই আছি।"

৫৮ হিজরী সালের ১৭ রমযান তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৬ বছর। তিনি রেখে গেলেন বিরাট এক আদর্শ যা সর্ব যুগে সমানভাবে অনুকরণীয়।

হযরত উম্মে সুলাইম

হযরত উম্মে সুলাইম ছিলেন নবী করীম সা.-এর খালা। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন মালিক বিন নাজ্জার। এরপর প্রখ্যাত সাহাবী আবু তালহার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত আনাস রা. ছিলেন তাঁর প্রথম বিয়ের সন্তান। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন মধুর দাম্পত্য জীবন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পরম প্রিয় স্বামী মালিক বিন নাজ্জারের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইসলাম এবং কুফর কখনো একত্রে মিলে থাকতে পারে না। কুফর বরদাশত করতে পারে না ইসলামী আদর্শের অনুসরণকারীকে। হযরত উম্মে সুলাইমকে দ্বীন থেকে সরিয়ে আনার যাবতীয় কলা-কৌশল যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো তখন তাঁর স্বামী দেশ ত্যাগ করলো। হয়তো সে আশা করেছিল যে, স্বামীর মায়া তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সে (উম্মে সুলাইম) আদর্শ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু উম্মে সুলাইমের ঈমানের মধ্যে কোন দুর্বলতা বা কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি সত্যিই নিজের যাবতীয় কিছু জান্নাতের বিনিময়ে বেঁচে দিয়েছিলেন। তার ঈমান এবং আমল ছিল পূর্ণ সামঞ্জস্য। স্বামীর প্রেম, দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ কিছুই তাঁকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারলো না। স্বামীকে ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টাই তিনি করলেন না।

বিদেশেই মালিক বিন নাজ্জারের মৃত্যু হয়। এরপর আবু তালহা তাকে বিয়ের পয়গাম পাঠায়। কিন্তু আবু তালহা তখনো ইসলাম গ্রহণ না করায় উম্মে সুলাইম অসম্মতি জানান। তিনি আবু তালহাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু তালহা, তুমি কি জানো যে, তোমার মাবুদ সৃষ্ট। আবু তালহা বললো,

www.bjilibrary.com

হ্যাঁ। জবাব শুনে তিনি আবার বললেন, তাদের পূজা করতে তোমার লজ্জা হয় না ?"

এর কিছুদিন পর আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলে উম্মে সুলাইম বিয়েতে রাজি হলেন। বিয়ে হয়ে গেলে তিনি স্বামীর নিকট প্রাপ্য মোহর মাফ করে দিয়ে বললেন ঃ ইসলামই আমার মোহর।

একবার তার এক ছেলের মৃত্যু হয়। হযরত আবু তালহা রাতে সফর থেকে বাড়ী ফিরে এসে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "ঘুমিয়ে আছে।" এর বেশী কিছু বলে তিনি স্বামীকে বিব্রত করতে চাইলেন না। তিনি যথারীতি স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করলেন। সকালে স্বামীকে বললেন ঃ "তোমার নিকট কোন জিনিস আমানত থাকলে তা ফিরেয়ে নিতে চাইলে কি তুমি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করবে ?" আবু তালহা রা. বললেন, কখনো না, আমানতের জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকার কোন অধিকার আমার নেই।

উম্মে সুলাইম বললেন, "আল্লাহ আমাদের পুত্র ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে। হযরত আবু তালহা পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দেরীতে পেয়ে ব্যথিত হয়েছিলেন।

ধৈর্যের প্রতীক উম্মে সুলাইম রাসূলে করীম সা.-এর পরিচালিত যুদ্ধের ময়দানে বহুবার গিয়েছিলেন। কোন অসুবিধাই তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি ওহুদ, হোনায়েন প্রভৃতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের মধ্যে নৈরাশ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও উম্মে সুলাইম উৎসাহ সহকারে তার কাজ করে যাচ্ছিলেন। গর্ভাবস্থায়ও তিনি হোনায়েনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের মাঠে তাঁর হাতে একটা ছুরি দেখতে পেয়ে হযরত আবু তালহা নবী করীম সা.-এর কাছে বলে দিলেন। নবী করীম সা. জিজ্ঞেস করলেন, "এটা দিয়ে কি করবে ?" উম্মে সুলাইম জবাব দিলেন, "কোন কাফের আমার কাছে এসে পড়লে এটা তার পেটে ঢুকিয়ে দেব।" আল্লাহর রাসূল জবাব শুনে মৃদু হাসলেন।

হযরত উম্মে সুলাইম ঘরে-বাইরে, সুখে-দুঃখে যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন সকল যুগের মহিলাদের জন্যে তা এক উত্তম আদর্শ।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে আম্মারা

হযরত উম্মে আম্মারা রা.-এর আসল নাম নাসিবা। তিনি খাজরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জায়েদ বিন আসীমের সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। দ্বিতীয় বিয়ে হয় আরবা বিন আমরের সাথে।

মদীনায় ইসলামের আওয়াজ পৌছানোর কিছুদিনের মধ্যেই মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইসলাম কবুল করে নিলেন। হযরত উম্মে আম্মারা এবং তাঁর গোত্রের লোকও কবুল করলেন এ দাওয়াত। তারা সপে দিলেন তাদের জান-মাল রাসূলের নিযুক্ত প্রচারকদের কাছে।

পরবর্তী হজ্জের মওসুমে হযরত উম্মে আম্মারা এবং তাঁর স্বামী এলেন মক্কা মোয়াজ্জমায়। মদীনার মুসলমানগণ বাইয়াত গ্রহণ করলেন রাসূলের কাছে। বাইয়াত শেষ হলে হযরত উম্মে আম্মারার স্বামী তাঁকে এবং অপর এক মহিলাকে হাজির করে বললেন ; হে আল্লাহর রাসূল এ দুজন মহিলাও বাইয়াত করার জন্যে আমাদের সাথে এসেছেন। রাসূলে খোদা বললেন, তোমাদের জন্যে বাইয়াতের যে শর্ত মহিলাদেরও তাই। মুসাফা করার দরকার নেই। আমি মহিলাদের সাথে মুসাফা করি না।

হযরত উম্মে আম্মারা বহুবার রাসূলে করীম সা.-এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছেন। একবার ওহুদ যুদ্ধে নিশ্চিত জয়ের মুখে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল, কাফেররা ঝাঁপিয়ে পড়লো নবী করীমের ওপর চারিদিক থেকে, তখন উম্মে আম্মারা অদূরে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। দৌড়ে এলেন নবী করীমের কাছে। শত্রুদেরকে বীর বিক্রমে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। প্রথমে তাঁর হাতে কোন ঢাল ছিল না। অবশেষে কোনক্রমে একটি ঢাল যোগাড় করে তিনি কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। ইবনে কমিয়া রাসূলকে হত্যা করার জন্যে সদর্পে অগ্রসর হলে হযরত উম্মে আম্মারা তাকে বাধা দিলেন। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সে তার মাথায় মারাত্মক আঘাত করলো। তিনি তাকে আঘাত করলেন কয়েকবার। কিন্তু শরীরে মজবুত বর্ম থাকায় সে কোনরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হলো না। উম্মে আম্মারার জখমটি এত গভীর ছিল যে, পূর্ণ এক বছর চিকিৎসা করেও তিনি সুস্থ হতে পারেননি। কিন্তু এতেও তিনি পিছপা হননি। অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন। অশ্বারোহী কাফের সৈন্য এসে তাঁকে আক্রমণ করতো। তিনি ঢাল দিয়ে ঠেকাতেন। সৈন্যটি অপর দিকে মুখ ফিরালে তিনি তার ঘোড়ার পা কেটে দিতেন। ঘোড়া ধপাস করে মাটিতে পড়ে যেতো আরোহীসহ। নবী করীম

সা. উম্মে আম্মারার ছেলে দু'টিকে তার সাহায্যার্থে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে শত্রু নিধনে লেগে গেল।

ওহুদের যুদ্ধে উম্মে আম্মারার পুত্র আবদুল্লাহ আহত হন। তার হাত থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিল। নবী করীম সা. হাত ব্যাণ্ডেজ করার জন্যে বললে তিনি হাত বেঁধে দিলেন। ছেলের যখম দেখে তিনি কোন আক্ষেপ করলেন না বা সান্ত্বনা দিলেন না বরং আদেশ করলেন, "যাও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।"

রাসূল সা. তাঁর নিষ্ঠা দেখে খুব খুশী হলেন। কয়েকবার আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এমন সাহস কার আছে। উম্মে আম্মারা একটু পরেই ছেলের আঘাতের প্রতিশোধ নিলেন। আঘাতকারী তাঁর সামনে এসে হাজির হলে তিনি তার উরু কেটে দিয়েছিলেন।

পার্থিব কোন লাভের জন্যে তিনি যুদ্ধ করেননি। একমাত্র আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে তার সন্তোষ লাভের জন্যেই তিনি শত্রুর তরবারি, বর্শার আঘাত হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন। পারলৌকিক জীবনের শান্তির জন্যেই আহত পুত্রকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তিনি অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল সা. যখন দোয়া করছিলেন তখন উম্মে আম্মারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন যেন জান্নাতে আপনার সাথেই থাকতে পারি।" নবী করীম সা. দোয়া করলে তিনি খুশী হয়ে বললেন, এখন আমার আর কোন ভাবনা নেই। দুনিয়ার যে কোন বিপদ বরদাশত করতে পারবো।

ওহুদ যুদ্ধ ছাড়াও তিনি খায়বার, হুনায়েন, ইয়ামামা প্রভৃতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূল সা.-এর ওফাতের পরেও উম্মে আম্মারা বহু দিন বেঁচে ছিলেন। খলীফা আবু বকর রা.-এর শাসনকালে তিনি একটি যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

নবী করীম সা.-এর ওফাতের পর ইয়ামামার যালিম সরকার মোসায়লামা ইসলাম ত্যাগ করে। তার গোত্রের চল্লিশ হাজার লোকও তার পথ অনুসরণ করে। এদের প্রত্যেকেই ভাল যোদ্ধা ছিল। শক্তির মোহে অন্ধ হয়ে মোসায়লামা নিজেকে পয়গম্বর হিসেবে ঘোষণা করলো। তার অসত্য নবুওয়াতকে কেউ অস্বীকার করলে সে এবং তার অনুসারীরা খুবই যুলুম করতো।

এ সময় একদিন হযরত উম্মে আম্মারার ছেলে হাবিব বিন জায়েদ আম্মান থেকে মদীনা আসছিলেন। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদাররা তাকে রাস্তা থেকে

www.bjilibrary.com

ধরে নিয়ে মোসায়লামার কাছে হাজির করলো। মোসায়লামা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "মোসায়লামা আল্লাহর রাসূল তা কি তুমি বিশ্বাস কর না? তিনি শক্ত করে বললেন, "না"। মোসায়লামা হাবিব বিন জায়েদের এক হাত কেটে দিল। একই প্রশ্ন মোসায়লামা আবার করলো। মর্দে মু'মিন একটুও ভীত না হয়ে নির্ভীক কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন। যালিম মোসায়লামা তাঁর অপর হাত কেটে ফেললো। একে একে মোসায়লামা তার প্রত্যেকটি অঙ্গ কেটে ফেললো। কিন্তু উম্মে আম্মারার ছেলে দ্বীনের নির্ভীক সেনানী প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে করলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এ হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর যখন মদীনায় পৌঁছলো উম্মে আম্মারা একটুও বিচলিত হলেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তিনি সব দুর্বলতা সরিয়ে ফেললেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই ছিল তাঁর কাছে বড় এবং তিনি জানলেন যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তারা মৃত নয় বরং তারা জীবিত। শহীদ আল্লাহর প্রিয়তম মানুষ। তিনি সবর করলেন এবং শপথ করলেন যে, যদি মোসায়লামাকে শায়েস্তা করার জন্যে আমিরুল মু'মিনীন কোন বাহিনী পাঠান, তাহলে তিনিও যাবেন এবং মোসায়লামাকে হত্যা করবেন।

হযরত আবু বকর রা. এ খবর জানতে পেরে খালিদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী ইয়ামামা পাঠালেন। হযরত উম্মে আম্মারা বার্ধক্যের ক্লান্তি ও দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে তাদের সঙ্গী হলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং খালেদ বিন ওলিদের বাহিনী বিজয়ী হয়। হযরত উম্মে আম্মারা শত্রুদের তীর ও তরবারির আঘাত সহ্য করে মোসায়লামার দিকে ধাবিত হন এবং আক্রমণ করেন। শত্রুব্যূহ ভেদ করে যাওয়ার সময় তরবারির আঘাতে তাঁর একটা হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি এতেও না দমে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। ইতোমধ্যে অন্য একজনের তরবারির আঘাতে মোসায়লামার মৃত্যু হয়। উম্মে আম্মারা ইসলামী আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। রাসূল সা. তাকে খুব স্নেহ করতেন। হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল সা. বলেছেন, যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেদিকেই হযরত উম্মে আম্মারাকে যুদ্ধ করতে দেখেছি।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে সালমা

হযরত উম্মে সালমা তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ বিন আসাদের সাথে নবুওয়াতের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সা.-এর নির্দেশে তারা প্রথমে হাবশায় হিজরত করেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে তারা মক্কায় বসবাস করেন। পরে মদীনায় হিজরত করার মনস্থ করেন। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে দিতে চাইলো না। তারা ভাবলো উম্মে সালমা রা.-কে যেতে না দিলে আবু সালমাও মক্কা ত্যাগ করতে পারবে না এবং নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে হয়তো ফিরে আসবে। কিন্তু আবু সালমা আল্লাহর হিজরতের আদেশকে মাথা পেতে নিলেন। স্ত্রী-পুত্রের মায়া তাকে থামিয়ে রাখতে পারলো না। তাদের একটি মাত্র উট ছিল। উটের ওপর উম্মে সালমা এবং সন্তানকে চড়িয়ে আবু সালমা চলছেন। পথিমধ্যে উম্মে সালমার গোত্রের লোকেরা বাধা দিয়ে বললো এমন খারাপ অবস্থায় আমাদের মেয়েকে যেতে দেব না। এই বলে তারা জোর করে পুত্রসহ উম্মে সালমাকে রেখে দিল। ইতোমধ্যে আবু সালমার গোত্রের লোকজন এসে শিশুটিকে কেড়ে নেয়। তারা বলে, তোমরা তোমাদের মেয়েকে স্বামীর সাথে যেতে যখন দিচ্ছ না তখন আমাদের বাচ্চাকেও আমরা তোমাদের মেয়ের কাছে থাকতে দেব না। তখন তারা তিনটি প্রাণী পরস্পর আলাদা হয়ে পড়ে। যেহেতু হিজরতের হুকুম ছিল, তাই আবু সালমা মদীনা চলে গেলেন।

উম্মে সালমা রোজ সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়ে একটা টিলার ওপর বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতেন। এমনি করে এক বছর কেটে গেল। এরপর সবার মায়া হলো। তারা বললো ঃ "তুমি ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে চলে যেতে পারো।" পুত্রকেও তারা ফিরিয়ে দিলো।

তিনি একাকী রওনা দিলেন সমস্ত বিপদ-আপদ বরণ করে। কিন্তু অসত্যের কাছে তিনি মাথা নত করেননি। এরপর মদীনায় পৌঁছলে ওহুদ যুদ্ধে তার স্বামী আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করেন। পরে নবী করীম সা.-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

উম্মে সালমা অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন কোন সাহাবীই রাসূল সা.-এর কথা মেনে নিতে পারছিলেন না তখন রাসূল সা. খুব বিব্রতবোধ করছিলেন। এ সময় উম্মে সালমা বললেন, আপনি কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে কুরবানী করুন এবং ইহরামের জন্যে মাথা মুড়িয়ে ফেলুন।

www.bjilibrary.com

তার কথা নবী সা.-এর মনঃপুত হলো। তিনি মাথা মুণ্ডন করে কুরবানী করলেন। সাহাবীরাও তখন অনন্যপায় হয়ে রাসূল সা.-এর অনুসরণ করলেন।

এমনিভাবে উম্মুল মু'মিনীন ইকামাতে দ্বীনের কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন তাঁর স্বামীকে।

হযরত সুফিয়া

হযরত সুফিয়া ছিলেন রাসূল সা.-এর ফুফু। হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাজে যে শান্তি আসতে পারে না একথা তিনি খুব ভালমত হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। যার জন্যে তিনি যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর একটা দলকে বিপর্যস্ত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসতে দেখে তিনি খুব ব্যথিত হন। তিনি পলায়নকারী সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করছিলেন ফিরে আসার জন্যে। এ যুদ্ধে সুফিয়ার সহোদর মহাবীর হামজা রা. নিহত হন। কাফেররা তার লাশের অবমাননা করে। কাফের নেতা উতবার মেয়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা আমির হামজার বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়েছিল।

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর হযরত সুফিয়াকে সেদিকে আসতে দেখে হুজুর সা. মনে করলেন ভাইয়ের ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখে তিনি হয়তো সহ্য করতে পারবেন না। তাই তিনি হযরত যুবায়েরকে আদেশ দিলেন লাশ ঢেকে রাখতে। কিন্তু কাছে এসে সব শুনে হযরত সুফিয়া বললেন, "আল্লাহর পথে এটা কোন বড় কুরবানী নয়। এরপর রাসূল সা. তাঁর লাশ দেখার অনুমতি দিলে তিনি বললেন, "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

খন্দকের যুদ্ধে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা সর্ব যুগের মুসলমানেরা চিরদিন স্মরণ রাখবে। এ যুদ্ধে মুসলমান মহিলাদের একটা আলাদা দুর্গে একত্রিত করে হযরত হাসসানকে তার রক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ইহুদীরা এ দুর্গটি অরক্ষিত ভেবে আক্রমণ করতে মনস্থ করে এবং এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে একজন লোক পাঠায়। হযরত সুফিয়া রা. এ খবর জানতে পেরে তাকে হত্যা করার জন্য হাসসানকে অনুরোধ জানান। কিন্তু হাসসান রা. তাতে রাজী না হয়ে অপারগতার কথা জানায়। অগত্যা হযরত সুফিয়া তাবুর একটি খুঁটি নিয়ে ইহুদীটির মাথা ভেঙে ফেলেন। এরপর তার অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিয়ে মাথা কেটে প্রাচীরের ওপর দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। যাতে অন্যেরা দুর্গ আক্রমণের সাহস না পায়।

www.bjilibrary.com

এমনিভাবে এ মুজাহিদা আমরণ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন।

হযরত খানসা

হযরত খানসা একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। শুধু কবিই নন তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মাতা। তিনি তার চার ছেলেসহ যুদ্ধে যোগদান করেন। এ সময় তিনি পুত্রদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সর্ব যুগের মায়েদের জন্যে এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বলেছিলেন, "হে প্রিয় ছেলেরা! তোমরা নিজের ইচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছ এবং হিজরত করেছ। এছাড়া দেশ ছাড়ার আর কোন কারণ ছিল না। আল্লাহর কসম! তোমরা এক পিতা-মাতার সন্তান, আমি তোমাদের পিতার সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং তোমাদের মায়ের নামেও কলঙ্ক লেপন করিনি।"

হে ছেলেরা ! তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে আর সত্যের শত্রুদের সাথে জিহাদ করা খুবই সওয়াবের কাজ। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার জীবনের চেয়ে পরকালের জীবন অনেক উত্তম। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ ! বিপদে ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর এবং সবর কর। তাদের সাথে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত থাক তাহলে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।" হে পুত্রগণ ! একথাগুলো মনে রেখে কাল যুদ্ধে যোগ দেবে। আল্লাহর সাহায্য চাইবে এবং শত্রুর সাথে লড়বে। যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেলে শত্রুর নেতাকে আক্রমণ করবে। ইনশাআল্লাহ সসম্মানে সাফল্য লাভ করে জান্নাতে যেতে পারবে।"

পরদিন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হলো। ছেলেরা মায়ের উপদেশ স্মরণ করে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তারা বীর বিক্রমে লড়েছিলেন। এটা ছিল কাদেসিয়ার যুদ্ধ। যুদ্ধে তার সবকটি ছেলেই শহীদ হন। শাহাদাতের খবর পেয়ে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং বলেন, "সন্তানদের শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও তাদের সাথে থাকতে পারবো এ আশা করি।"

শুধু মক্কার কুরাইশ এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারাই ইকামাতে দ্বীনের কাজে নবী সা.-এর সাথী ছিলেন না বরং সাধারণ আনসার মহিলারাও কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এ বিপ্লবী কাফেলায় এবং রেখে গেছেন তাদের উজ্জ্বল আদর্শ।

www.bjilibrary.com

তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসতেন দুনিয়ার যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশী। রাসূল সা.-এর কোন দুঃসংবাদে তারা বিচলিত হয়ে পড়তেন।

এমনি একটি ঘটনা। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আদেশ পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে পালন না করায় ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ওপর নেমে আসে বিপর্যয়। অসংখ্য সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূল সা.-ও আহত হন। শত্রুর তীরের আঘাতে তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। যুদ্ধের ময়দানে রাসূল সা.-এর মৃত্যু সংবাদে সাহাবারা হতাশ হয়ে পড়েন। এ খবর পৌঁছে যায় মদীনাতেও। জনৈক আনসার মহিলা মহানবীর ইনতিকালের খবর পেয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। প্রকৃত সংবাদ পাওয়ার জন্যে তিনি ওহুদ পাহাড়ের দিকে ছুটে যান।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একদল লোকের সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাদের কাছে আল্লাহর রাসূলের খবর জিজ্ঞেস করে কোন জবাব পান না। এদের একজন বললো ঃ শত্রুর তরবারির আঘাতে আপনার পিতা শহীদ হয়েছেন। তিনি মোটেই বিচলিত হলেন না। উচ্চারণ করলেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরপর আগের মতো জিজ্ঞেস করলেন নবী করীম সা.-এর অবস্থা বলুন। তিনি কেমন আছেন। লোকগুলো এবারও তার কথার সঠিক জবাব না দিয়ে বললো, আপনার স্বামী শহীদ হয়েছেন ওহুদের ময়দানে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, "আপনার পুত্র শাহাদাত বরণ করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তি তার ভাইয়ের শাহাদাতের খবর দিল। তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন পড়লেন। একে একে চারজন প্রিয় ব্যক্তির শাহাদাতের খবর শুনেও তার মন থেকে নবী করীম সা.-এর চিন্তা দূর হলো না। তিনি আগের মতো ব্যস্ততার সাথে জানতে চাইলেন রাসূল সা.-এর খবর।

এবার তারা বললো, নবী করীম সা. ফিরে এসেছেন। তিনি ভাল আছেন। আনসার মহিলাটি এতেও নিশ্চিত হতে না পেরে বললেন, তিনি কোথায় আছে বলুন।

তারা সামনে একটি জনতা দেখিয়ে দিল। তিনি সেখানে গিয়ে নবী করীম সা.-কে দেখে আশস্ত হলেন এবং তাঁকে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান ; কারও মৃত্যুর জন্যে আমি চিন্তা করি না।

www.bjilibrary.com

রাসূল সা.-এর প্রতি এতো ভালবাসা না থাকলে একটা আদর্শ সমাজের গোড়াপত্তন হবে কেমন করে?

এমনিভাবে শুধু দু-একজন নয়, বহু সংখ্যক মহিলা সাহাবী রাসূল করীম সা.-এর ইকামাতে দ্বীনের কাজে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন। তারা সরিসরি লিপ্ত হয়েছেন বাতিলের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষে, জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন নিজের প্রাণপ্রিয় স্বামী-সন্তানকে।

www.bjilibrary.com

বর্তমান সমাজে মহিলাদের ভূমিকা

অতীতে মহিলারা ইকামাতে দ্বীনের কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন সরাসরি নবী-রাসূলদের নেতৃত্বে। বর্তমানেও যদি আমরা ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—পেতে চাই জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে ; তাহলে অতীত যুগের মতো নারীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে পুরুষের পাশাপাশি। আমরা দেখতে পাই ইকামাতে দ্বীনের এ দায়িত্ব পালনে নারীরা সংগ্রাম যুগে যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি ভূমিকা রেখেছেন বিজয় যুগেও। বর্তমানে আমাদের সমাজে যেহেতু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই এবং শুধু প্রতিষ্ঠিত নেই তাই নয়, বরং একে উৎখাত করারও ষড়যন্ত্র চলছে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন কৌশলে, আর এ ক্ষেত্রে মেয়েরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

মেয়েরা স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ। কিন্তু পুরুষদের নেতৃত্ব যেমন শিক্ষিত পুরুষদের হাতে তেমনি মেয়েদের নেতৃত্বও গুটিকতক শিক্ষিত মেয়েদেরই হাতে। শিক্ষিত পুরুষদের তুলনায় শিক্ষিত মহিলারা ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞ এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার একটা বাস্তব কারণ হলো আমাদের সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। এখানে দ্বীনি শিক্ষার একমাত্র বাহন হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষার যে প্রচলন রয়েছে তাতে মহিলাদের কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। উপরন্তু ওয়াজ মাহফিল থেকে শুরু করে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম যা কিছু হয় আমাদের সমাজে তা পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে আধুনিক শিক্ষার কুফল থেকে আধুনিক শিক্ষিত মহিলা সমাজকে রক্ষা করার অন্য কথায় আধুনিক জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোকজ্জ্বল পথে ধাবিত করার কোন সুযোগই এ সমাজে নেই। ফলে আধুনিক খোদাবিহীন শিক্ষার বদৌলতে ইসলাম বিরোধী অনেক কিছুই মেয়েরা শিখছে এবং আধুনিকতা ও প্রগতির নামে সেগুলো তারা অবলিলাক্রমে চর্চাও (Practice) করে চলেছে। ময়দানে ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদেরকে ব্যবহার করছে। আল কুরআনেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথাটিকে ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্ত ভাবে ঃ

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ

www.bjilibrary.com

الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই পরস্পরের সাথী ও সহযোগী। তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ থেকে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। এ মুনাফিকরাই নিসন্দেহে ফাসেক। এ মুনাফিক পুরুষ এবং নারী ও কাফেরদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এটাই তাদের জন্যে উপযুক্ত। তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং স্থিতিশীল আযাব রয়েছে।"

—সূরা আত তাওবা ঃ ৬৭-৬৮

বর্তমান সমাজে ইসলাম বিরোধী নারী এবং পুরুষ বাতিলের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঈমানদারেরা এ সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইসলাম প্রিয় মহিলারা বিভিন্ন অজুহাতে পিছিয়ে থাকছে। শুধু পিছিয়ে থাকছে তাই নয় বরং ময়দানে ইসলাম বিরোধী তৎপরতার কারণে ইসলাম প্রিয় মহিলারা নানাভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে। ইসলামের পূর্ণরূপ বর্তমানে আমাদের সমাজে অনুপস্থিত। শুধু আমাদের দেশই নয়, বিশ্বের কোথাও পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই, ফলে এর কল্যাণময় দিকগুলো মানুষের সামনে অনুপস্থিত। ফলে আল্লাহ প্রদত্ত আইন সম্পর্কে উঠেছে নানারূপ আপত্তি, আসছে 'সংশোধনী প্রস্তাব'। বর্তমানে নারী অধিকার আদায়ের নামে প্রগতিশীল মহিলারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কারণ ইসলামের প্রকৃতরূপ তাদের জানা নেই। অনৈসলামী সমাজে কোন অধিকার, কোন মর্যাদাই তারা পাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে তারা বিকল্প পথ বেছে নিয়েছেন। অথচ তারা জানেন না, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে সেই পথ অনুসরণ ছাড়া মুক্তি ও কল্যাণের আর কোন বিকল্প নেই। অথচ সেই অধিকার আংশিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলেও পাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন পূর্ণ ইসলামের প্রতিষ্ঠা। কাজেই নারীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে তেমনি একটা সমাজ গঠনের কাজে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আদর্শ রাসূল সা.। তিনি এ কাজ করতে গিয়ে ঘরকে উপেক্ষা করেননি। বরং সর্বস্তরের জনমানুষের অনুসরণযোগ্য বাস্তব জীবনের সুন্দরতম নমুনা উপস্থাপন করেছেন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যে "উসয়ায়ে হাসানা" বা সর্বোত্তম আদর্শ। এ আদর্শকে সামনে রেখে পুরুষদেরকে যেমন তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে তেমনি দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে নারীদেরকেও। আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ কাজ কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকাহ্র দৃষ্টিতে ফরয যেমন নারীর জন্যে তেমনি পুরুষের জন্যেও। আর রাসূল সা. নারী-পুরুষ উভয়কে সাথে নিয়ে এ ফরয কাজের আঞ্জাম দিয়ে বাস্তব নমুনা রেখে গেছেন। সেই নমুনার আলোকে যদি পুরুষ পুরুষ হিসেবে, নারী নারী হিসেবে এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় তাহলে সংসার জীবনের ভারসাম্য নষ্টের কোন আশংকা থাকে না। রাসূল সা. যে আদর্শ রেখেছেন তার দাবীই হলো সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা। রাসূল সা.-এর আদর্শের আলোকে নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র তার ঘর। সমাজ ও জাতীয় জীবনে ঘরের গুরুত্বকে সামনে রেখেই রাসূল সা.-এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ "তোমরা ঘরের মধ্যে শান্তির সাথে অবস্থান কর।"

—সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩

কিন্তু যে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই—নেই সত্যিকার কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান দান এবং সেই অনুযায়ী চলার সুযোগ, সেখানে মহিলাদের মাঝে কাজ করার দায়িত্ব বহন করতে হবে মেয়েদেরকেই এবং তাও হতে হবে সংঘবদ্ধভাবেই। অন্যথায় আমরা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী মায়েরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামী বিধি-বিধান শিখালেও ভালভাবে গড়ে তুলতে ছোট বেলা থেকে চেষ্টা করলেও, একটু বড় হলেই তারা যে পরিবেশে মিশবে আর যে দশটা পরিবার থেকে সন্তানেরা আসবে—যারা তাদের বন্ধু বা সাথী হবে, যদি তাদের মধ্যে দোষ থাকে তবে আমরা কি আমাদের সন্তানদেরকে পারবো তা থেকে রক্ষা করতে? কাজেই আমাদের সন্তানদেরকে গড়ার স্বার্থে সেসব পরিবারের মা'দের গড়ার দায়িত্বও আমাদেরই নিতে হবে। অন্তত কিছু সংখ্যক মুসলিম মায়েদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এ দায়িত্ব পালনে। এর জন্যে প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনবোধে কিছু সংখ্যক মহিলাকে সংসারের কাজ কিছুটা সংক্ষেপ করে হলেও এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর এ ধরনের মহিলা সমাজে

www.bjilibrary.com

খুব বেশী নেই বিধায় অল্প যে ক'জন আছেন তাদেরকে ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হলে চলবে না। সংসার ছেড়ে কিছু সময় বাইরে গেলে সমস্যা হয়তো আসবে কিন্তু মনে রাখতে হবে আল কুরআনের এ ঘোষণা ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতেই হবে যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে এবং তারাই সাফল্যমণ্ডিত হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪

এ সাফল্য পাওয়াটাই মু'মিন জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সংসার যেহেতু পুরুষ, নারী এবং সন্তানকে নিয়েই, সে ক্ষেত্রে পুরুষকেও এগিয়ে আসতে হবে সহযোগিতা করার জন্যে যাতে করে মহিলাটি ইকামাতে দ্বীনের কাজে যাওয়ার ফলে যে অসুবিধা হয় তা যেন সবাই হাসিমুখে মেনে নিতে পারে। পরিবারের সবার মধ্যে এ অনুভূতি জাগাতে হবে যে, "মু'মিনের জান-মাল আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।" কাজেই এ জান-মাল তাঁর ইচ্ছা মতই ব্যয়-ব্যবহার করতে হবে।

সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনের কাজটা আল্লাহর কাজ। সুতরাং এ কাজে শরীক হতে পারাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া এ পথে আসা এবং টিকে থাকা অসম্ভব। অবশ্য যারা নিষ্ঠার সাথে পথ চলার সিদ্ধান্ত নেয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط

"যারাই আমার পক্ষে সংগ্রাম সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকি।"–সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯

কাজেই এ পথে চলার জন্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের এ কাজ আল্লাহ এবং রাসূলের সরাসরি নির্দেশ। এ নির্দেশ পাওয়ার পর কারও এ কাজ থেকে দূরে থাকার অধিকার নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

"কোন মু'মিন পুরুষ এবং কোন মু'মিন স্ত্রীলোকের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দিবেন, তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজেই কোন ফায়সালা করার ইখতিয়ার রাখবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬

বর্তমান সমাজে ইসলামী আন্দোলনের একজন মহিলা কর্মীর কাজগুলোকে আমরা নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

এক ঃ নারী সমাজে ইসলামের সঠিক ধারণাদানের কাজ নারীরাই ফলপ্রসূভাবে করতে পারে। বাস্তবে যেহেতু এ ক্ষেত্রে নারীদেরই কাজে তাদের সমস্যা সমাধানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তার সঠিক উপলব্ধি এবং বাস্তব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নারীদের পক্ষেই সম্ভব। কাজেই নারীদেরকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রয়োজন কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতার। আর শিক্ষিত পুরুষদের হাতে যেমন সমাজের চাবিকাঠি, তেমনি শিক্ষিত মহিলারাই পরিচালনা করেছেন এ দেশের নারী সমাজ, কাজেই এ কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষিত মহিলাদের উল্লেখযোগ্য অংশকে ইসলামের সঠিক ধারণা দিতে হবে এবং সজাগ, সচেতন ও সক্রীয় কিছু মহিলাকে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে করে তারা দেশের ধর্মপ্রাণ মা-বোনদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে এবং সত্যিকারের মুক্তি আন্দোলনের দিশারী রূপে ভূমিকা পালনে প্রয়াস পান।

দুই ঃ আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা পুরুষদের মাঝেই অনেক কম আর মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কাজেই অশিক্ষিতদের মাঝে ইসলাম শেখানোর কাজ করতে হবে এবং এটা শুধু ওয়াজ করে সম্ভব নয়। এদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ সেবার কাজ করতে হবে। কুটির শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যা শিখাতে হবে। সাথে সাথে তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

তিন ঃ উপরোক্ত কাজগুলো সঠিকভাবে করার জন্যে শিক্ষিত মহিলাদের ইসলামী জ্ঞান বাড়ানোর জন্যে চেষ্টা করতে হবে। বাস্তব ময়দানে কাজ করা ছাড়া জ্ঞান বাড়ে না। এ জ্ঞান বাড়ানোর জন্যে কয়েক বছর পরিশ্রম করে কোন ডিগ্রী অর্জনের দরকার নেই। কুরআন-সুন্নাহর অর্জিত জ্ঞান (যতটুকুই জানা

www.bjilibrary.com

যায়) সমাজের কল্যাণের জন্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। রাসূল সা.-এর নির্দেশ ঃ "বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাও আয়াতান।"—"একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে অন্যদের কাছে পৌছাও।"

এটা শুধু মুখের কথা নয় এবং এ জন্যে দরকার বাস্তব উপলব্ধির। সমাজের খারাপ অবস্থা দেখে যার কষ্ট হয়, মানুষের নৈতিক অধপতন যাকে উতালা করে তোলে, সেইতো পারে মানুষকে সঠিক পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে। যেমনভাবে উতালা হতেন নবী-রাসূলগণ। হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর মুশরিক জাতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করলেন। তারকা, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে দেখলেন যে, প্রকৃত মাবুদ কে? এরপর তিনি চলার পথ পাওয়ার জন্যে ধরণা দিলেন সমস্ত বিশ্বের রব-এর নিকট। রাসূল সা.-এর জীবনেও আমরা দেখতে পাই, ছোট বেলা থেকেই জাতির দূরবস্থা, দুর্দশা তাকে কষ্ট দিত। তিনি ভাবতেন কিসে জাতির কল্যাণ হবে। এ ভাবনাই তাকে উদ্বুদ্ধ করে জনগণের জন্য কল্যাণকর কাজ করাতো। এক পর্যায়ে তিনি হেরা পাহাড়ের গুহায় ধ্যান-মগ্ন হলেন এবং তারপর এলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশিকা—আল হুদা, আল কুরআন–যার মধ্যে রয়েছে সমস্ত মানব জাতির জন্যে সঠিক চলার পথ। আমাদের মনের মধ্যেও যদি জাতির নৈতিক অধপতন, সমাজের দুদর্শা-দুর্গতির বাস্তব জীবন চিত্র দর্শনে পেরেশানী সৃষ্টি না হয় তবে আমরা সঠিক পথ অনুসরণে জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারবো না। একমাত্র আল্লাহর মহব্বত ছাড়া নিস্বার্থভাবে জাতির সেবা অসম্ভব। এ জন্যে মনের মধ্যে কাজের প্রেরণা ও ঈমানী জজ্বা সৃষ্টি করতে হবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রেতো এ জজ্বা সৃষ্টির প্রয়োজন আরও অনেক বেশী। কারণ অনেক সময় হয়তো স্বামীর পক্ষ থেকে বাধা আসে। সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্য তাকে আটকে রাখে। কিন্তু ভিতরে প্রেরণা থাকলে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং এভাবে কাজ করতে করতে যে বাস্তব জ্ঞান অর্জিত হয় তাই হবে একজন সমাজ কর্মীর সবচেয়ে বড় পুঁজি।

চার ঃ দায়ী' ইলাল্লাহকে সর্বাবস্থায় ইসলামের বাস্তব প্রতীক হতে হবে। তার নিজের জীবনকে ঢালাই করতে হবে ইসলামী ছাঁচে। শুধু মুখের কথায় কেউ ইসলাম মেনে নেবে এ আশা করা বাতুলতা মাত্র। কুরআনে আল্লাহ পাকের ঘোষণা ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কেন সে কথা বল যা কাজে কর না।"
–সূরা আস সফ ঃ ২

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

"তোমরা অন্য লোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেদেরকে তোমরা ভুলে যাও ; অথচ তোমরা কিতাব পড়। তোমাদের বুদ্ধি কি কোন কাজেই লাগাও না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৪

অর্থাৎ মানুষ যে আদর্শের প্রচার করবে নিজের জীবনে সে সেই আদর্শের অনুসারী হবে। এটাই স্বাভাবিক। এর বিপরীত আচরণ বুদ্ধিহীনতারই নামান্তর এবং বাস্তবে ক্ষতিকরও বটে।

আর মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ ছাড়া নিজের সংশোধন ত্বরান্বিত হয় না। সত্যের পথে আহ্বানকারীর জীবনকে গোটা সমাজ অণুবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে যে, কোথায় তার ত্রুটি। একজন মনীষীর মন্তব্য—"যে পাত্র শত শত হাত পরিষ্কার করে তা যতো দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত ময়লাই হোক না কেন পরিষ্কার হতে বাধ্য।" এ তো বিনা পয়সার সার্চ লাইটে নিজেকে আলোকিত করা।

পাঁচ ঃ যেহেতু বাড়ীর পরিচালনা প্রধানত মহিলাদের হাতে কাজেই গৃহের পরিবেশকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। আজকাল ঘরে আর্টের নামে মূর্তি, ছবি ইত্যাদি রাখা হয়। আর এসব খুব কমই সুন্দর রুচির পরিচয় বহন করে। এগুলোকে বদলাতে হবে। আর একজন মহিলা খুব সহজেই এগুলোকে বদলে সুন্দর, রুচিকর শিক্ষামূলক জিনিস-পত্র দিয়ে তার ড্রইং রুমকে সাজাতে পারেন। খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও ইসলামী আইন-কানুন অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে।

পরিবারের যে সকল পুরুষ ইসলাম বিরোধী তাদেরকে মহব্বতের সাথে বুঝাতে হবে। বিভিন্নভাবে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে খোদায়ী আইনের যথার্থতা। এর জন্যে একদিকে যেমন মায়া-মমতা প্রয়োজন অন্য

www.bjilibrary.com

দিকে দরকার আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা। উমর ইবনুল খাত্তাবের বোন ফাতেমা এ ব্যাপারে এক জ্বলন্ত আদর্শ। ফাতেমা রা.-এর মহব্বত এবং দৃঢ়তা উমর রা.-এর কঠিন হৃদয়কে গলাতে সক্ষম হয়েছিল।

ছয় ঃ সন্তানদের গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রধানত মায়ের। সন্তানেরাই বাবা-মা'র সম্পদ। তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। অত্যন্ত সঠিকভাবে তাদের মধ্যে আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করে নয়, বরং সহানুভূতির সাথে ধীরে ধীরে তাদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে সূরা লুকমানে আল্লাহ বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছেন। কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে হবে তার রূপরেখা পেশ করেছেন। ছোট বেলা থেকে তাদেরকে শিরক-বিদআত সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান, বিনয়ী, ভদ্র, নম্র হতে শিখানো, দান-খয়রাতে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি মায়েদের কাজ। প্রতিনিয়ত সার্বক্ষণিক কাজের একজন আদর্শ মা-ই পারেন তার সন্তানের সামনে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরতে। গল্পের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে পারেন জিহাদী প্রেরণা। বড় বড় মনীষীদের জীবনী, নবী-রাসূলদের গল্প, সাহাবায়ে কিরামের কাহিনী ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরতে পারেন তাদের বিপ্লবী ইতিহাস। সৃষ্টি করতে পারেন অন্যায়ের সাথে আপোষহীনতার —আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা। কিন্তু তার জন্যে শর্ত হলো মা'কে হতে হবে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারিণী। জবাব দেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে তার সন্তানের ছোট অথচ অনুসন্ধিৎসু সব প্রশ্নের। যার জন্যে জ্ঞানার্জনের তাকীদ এসেছে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে। কিন্তু কোন্ জ্ঞান? বস্তুবাদী জগতের নফসের লালসা মেটানোর কলাকৌশল আয়ত্ত করার বা আল্লাহদ্রোহিতার কায়দা-কানুন শেখার জ্ঞান নয়। যে জ্ঞান মানুষকে তার প্রকৃত স্রষ্টাকে চিনতে সাহায্য করে সেই জ্ঞান। সে জ্ঞান বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সাত ঃ প্রতিবেশীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ঃ সংসার এবং সন্তানাদির দায়িত্বের পরেই আসে প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব। হাদীস শরীফে আছে ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন ঃ "জিবরাঈল আ. সবসময়ই আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকীদ দিচ্ছিলেন। এমন কি আমার ধারণা হয়েছিল হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পত্তির হকদার (ওয়ারিস) বানিয়ে দেয়া হবে।" হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত নবী করীম সা. বলেছেন, যখন তুমি তরকারী রান্না করবে, তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি

www.bjilibrary.com

দিবে, যাতে করে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খবর নিতে পার। (অর্থাৎ তা থেকে দিতে পার)।"

প্রতিবেশীর প্রতি এ দায়িত্ব শুধু জিনিস-পত্র লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জাহান্নামের আগুন থেকে তাঁকে বাঁচানোর ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকতে হবে। আর এ কাজ তখনই সম্ভব যখন তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যাবে। তাদেরকে অকৃত্রিম বন্ধু বানিয়ে ফেলতে হবে। বিভিন্ন সমস্যায়, বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এরপর বিভিন্ন হিকমতের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে ইসলামী আদর্শ। এভাবে প্রতিবেশী স্ত্রীলোকদের মাধ্যমে তাদের ঘরের পুরুষদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার পরোক্ষ ভূমিকা পালন করা সম্ভব। আর কাউকে কোন ইসলামী সাহিত্য পড়তে দিলে ঘরের সবাই সে বই পড়তে পারে।

আট ঃ আত্মীয়-স্বজনদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ঃ আত্মীয়-স্বজন যারা আছে তাদের বাড়ীতে সাধারণত পুরুষের চেয়ে মেয়েদেরই যাওয়া-আসা বেশী হয়ে থাকে। কাজেই আত্মীয়-স্বজনকে দ্বীনের পথে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। আর এটা সহজও। কারণ একটা অজানা লোকের মধ্যে কোন কথা বিশ্বাস করানো যত কঠিন পরিচিত পরিবেশে ততটা নয়। এছাড়া দায়ী'র উত্তম চরিত্রের কথা নিশ্চয়ই তার আত্মীয় মহলে অজানা থাকার কথা নয়। কাজেই এ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। কুরআন মজিদে দাওয়াত দেয়ার এ পদ্ধতি (Technique) আল্লাহ সূরা ইউসুফে শিখিয়েছেন। ইউসুফ (আ) যখন কারাগারে তখন কয়েদখানার সবাই তাঁকে উত্তম চরিত্রের লোক বলে জানতো। তাদের একজন যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এলো তখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার সাথে সাথে তিনি দ্বীনের দাওয়াতও দিয়ে দিলেন, বললেন ঃ

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

"হে কয়েদখানার সংগীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ, বহু সংখ্যক খোদা ভালো, না সেই এক আল্লাহ যিনি সবকিছুর ও পর বিজয়ী।"
–সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯

আমাদেরকেও এমনভাবে দায়ী' ইলাল্লাহ হিসেবে ভূমিকা রাখতে হবে। যেহেতু আমাদের মূল লক্ষ্য ইসলামকেই প্রতিষ্ঠিত করা, কাজেই মহিলাদেরকে এ কাজের আঞ্জাম দিতে হবে। সমাজের একটি অংশ হিসেবে শুধু পুরুষকে নিয়ে যেমন সমাজের কল্পনা করা যায় না, তেমনি শুধু মহিলারাও পারে না

www.bjilibrary.com

একটি সমাজকে গড়ে তুলতে। একটা আদর্শ সমাজ গঠনের তাই প্রয়োজন পুরুষ এবং নারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা। যে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে এটা জরুরী। এ সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন সংসার জীবনে, সমাজ জীবনে, তেমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও। একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে তার আন্দোলনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে প্রয়োজন অনেক সময়ের। স্বাভাবিকভাবেই তিনি অন্যের চেয়ে (যিনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী নন) সংসারের প্রতি কম নজর দিতে পারেন, অর্থ উপার্জনের জন্যও তিনি হয়তো প্রয়োজনানুপাতে সময় দিতে পারেন না। ফলে সংসারের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় বাস্তবভাবে তাকেই। এ ক্ষেত্রে যদি মহিলাটি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল না হন তাহলে কেমন করে তিনি হাসিমুখে সব সমস্যা সহ্য করে সহযোগিতা করবেন তার স্বামীকে ? এ জন্য শুধু ইসলামী আন্দোলনকে জানা-বুঝা যথেষ্ট নয় বরং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন একজন প্রকৃত কর্মীর যিনি বুঝবেন ময়দানের অবস্থা, স্বামীর কাজের গুরুত্ব এবং মেজাজ। তা না হলে স্ত্রীটি যা চাইবেন তা পাবেন না। ফলে সংঘর্ষ হয়ে ওঠবে অনিবার্য। আর সংসার জীবনে অশান্তি থাকলে কারও পক্ষেই সম্ভব হয় না বৃহত্তর ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করার। হযরত রাসূলে করীম সা.-এর জীবনে বিবি খাদিজার এ ভূমিকা পালন করা এ জন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি নিজে ছিলেন সেই বিপ্লবী কাফেলার প্রথম কাতারের একজন কর্মী।

অর্থাৎ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই রয়েছে সে দায়িত্ব পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। অনেকে এ কাজের মধ্যে রাজনীতির গন্ধ আবিষ্কার করেন। তাদের কাছে বাতিল আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে যেভাবে নারীরা এগিয়ে এসেছে সে চিত্রও রয়েছে। এর ফলে মহিলাদের পরিণাম কি হচ্ছে, হতে পারে তা ভেবে তারা আতংকিত হয়ে ওঠেন। অপর দিকে তারা মনে করেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে ইসলাম প্রিয় মহিলাদেরকেও এমনিভাবে ময়দানে টেনে আনা হচ্ছে কেন। কিন্তু তারা আসল চিত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। কারণ ইসলাম ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব মহিলাদেরকে শুধু এতটুকুই দিয়েছে, যতটুকু পালন করলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যা পালন করে গেছেন ইসলামের স্বর্ণ যুগের মহিলারা সরাসরি রাসূল সা.-এর নেতৃত্বে। আর রাসূল সা. তো নিশ্চয়ই স্বইচ্ছায় পরিচালিত কোন ব্যক্তি ছিলেন না।

www.bjilibrary.com

কাজেই আসুন, বোনেরা! আমরা আমাদের দায়িত্বকে জেনে নেই এবং শরীক হয়ে যাই এমন এক ফরয কাজে যার মধ্যে রয়েছে ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি।

-ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ-

১। ইকামাতে দ্বীন—অধ্যাপক গোলাম আযম।
২। দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব—মতিউর রহমান নিজামী।
৩। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন—মতিউর রহমান নিজামী।
৪। ইসলামী সংগঠন—এ, কে, এম, নাজির আহমদ।
৫। সংগ্রামী নারী—মোঃ নূরুজ্জামান।

www.bjilibrary.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- ※ বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
  – মোঃ আবুল হোসেন বি. এ.
- ※ পর্দা প্রগতির সোপান
  – অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
- ※ পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়?
  – সাইয়েদা পারভীন রেজভী
- ※ আদর্শ সমাজ গঠনে নারী
  – শামসুন্নাহার নিজামী
- ※ পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন
  – শামসুন্নাহার নিজামী
- ※ নারী মুক্তি আন্দোলন
  – শামসুন্নাহার নিজামী
- ※ নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার
  – শামসুন্নাহার নিজামী
- ※ একাধিক বিবাহ
  – সাইয়েদ হামেদ আলী
- ※ আল কুরআনে নারী ১ম খণ্ড
  – অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
- ※ আল কুরআনে নারী ২য় খণ্ড
  – অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
- ※ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা
  – আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
- ※ ইসলামী সমাজে নারী
  – সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
- ※ ইসলাম ও নারী
  – মুহাম্মদ কুতুব
- ※ মহিলা ফিকহ্ ১ম খণ্ড
  – আল্লামা আতাইয়া খামীস
- ※ মহিলা ফিকহ্ ২য় খণ্ড
  – আল্লামা আতাইয়া খামীস